# অনীক

**আগস্ট ২০১১**
**বর্ষ ৪৮ q সংখ্যা ২**



**সম্পাদকীয়** q ১

**ঘটনাপ্রবাহ**
লিবিয়া নিয়ে মিথ্যাচার চলছেই q দীপ্র চৌধুরী q ২
q মিশরে বিপ-ব পিছু হটছে ? q প্রবীণ রায় q ২

**প্রবন্ধ**
q অধিকারের রাজনীতি... q নীলাঞ্জন দত্ত q ৪
খুচরো ব্যবসায় বিদেশি লগ্নি q সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় q ৬
তদন্ত কমিশন... q সমরেশ মিত্র q ১১
পরমাণু শক্তি( বর্জন q সুজয় বসু q ১৬
দলতন্ত্র থেকে জনশক্তি( q শুভংকর চন্দ q ১৯

**পুস্তক আলোচনা**
বিজ্ঞান, দর্শন ও সমাজ q জয়ন্ত দাস q ২৮

**বিতর্ক**
বিতর্কের আপাতত অবসান... q মালবিকা মিত্র q ৩১
প্রসঙ্গ পরিবর্তন q রণেশ রায় q ৩৩
লেখকের জবাব q রতন খাসনবিশ q ৩৬

**পাঠকের কলমে**
মানবাধিকার আন্দোলন q প্রেমাংশু দাশগুপ্ত q ৪০



**যোগাযোগ, লেখা, চিঠিপত্র ও**
**টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা**
প্রযত্নে/পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
**দূরভাষ** ৯৪৩৩৮৭৭৫৬০
**গ্রাহকদের যোগাযোগ** ৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২
**বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা** ১৫০ টাকা
ই-মেল : □□□□□□64@□□□□□.□□□
ব্লগ □□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□.□□□

*কার্যালয়*
**১১, রাজা রামমোহন সরণী। কলকাতা ৭০০ ০০৯**
(মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে আটটা)



*সম্পাদকমণ্ডলী* **দীপংকর চত্র(বর্তী রতন খাসনবিশ সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব**




## সব কিছু ঠিক চলছে!

পঁয়ষট্টিতম স্বাধীনতা দিবসে নানা দলের নানা রাষ্ট্রনায়কদের উদাত্ত ভাষণ শুনে সলিল চৌধুরীর সেই বিখ্যাত গানটির কথা মনে পড়ছে 'সব কিছু ঠিক চলছে'। 'ঠিক চলছে' মানে চলছে সম্ভাব্যতার চেনা ছকেই। নেতাদের হাজার বক্ত(তা-প্রতিশ্রুতি ও স্তোকবাক্যকে হেলায় উড়িয়ে দিয়ে ত্র(মশ বাড়ছে, ত্র(মাগত বেড়েই চলেছে দুর্নীতি এবং তাকে চাপা দেবার প্রচেষ্টা, জিনিষপত্রের দাম, (মতার অপব্যবহার, সর্বোপরি বি(য়োনের বকলমে বি(-অর্থনীতির সিংহাসনের আসন থেকে অবনমিত-প্রায় মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্রের নির্দেশিত নয়া উদারপন্থী পথে এগোবার প্রতিযোগিতা। তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে মুষ্টিমেয়র ধনসম্পদ বৃদ্ধির এবং অন্তত ৭০ শতাংশ মানুষের ধারাবাহিক নিঃস্বকরণের প্রক্রি(য়া। এরকমটাই কি হবার কথা ছিল না?

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য বিপুল জনাদেশের ভিত্তিতে চলছে 'পরিবর্তন'-এর পালা। মাত্র পাঁচ মাসের পরিবর্তিত নতুন সরকার এর মধ্যেই কি চেনা ছকের মধ্যেই সব কিছু চালাবার প্রমাণ দিচ্ছে না? দু-পাঁচটা হাসপাতালে বা অফিসে দোর্দণ্ডপ্রতাপ মুখ্যমন্ত্রীর গতিশীল পদচারণা আপাত কিছু গতিশীলতা সঞ্চাররের বার্তা বহন করলেও (সেটা কিন্তু ১৯৭৫-৭৭-এর জ(রি অবস্থার প্রথম প্রহরেও ঘটেছিল) রাজ্যের সর্বত্র অফিস-কাছারি ব্যাংক-হাসপাতালে সেটা কি আদৌ ঘটছে? তার চেয়েও বড়ো কথা, কলকাতাকে লন্ডন বানানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, অথচ রাজ্যের ব্যাপক মানুষ থাকে যে জেলাগুলিতে সেখানে উন্নয়নের রূপরেখার উল্লেখ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। পরিবহন-জনস্বাস্থ্য ও সরকারি শি(া ব্যবস্থার যে ব্যাপক অবনতি ঘটেছিল পূর্ববর্তী জমানায়, তাকে অতিত্র(ম করার ল( ণ মিলছে না। বরং সিপিআই(এম) পার্টিতন্ত্রের স্থান ত্র(মশ গ্রহণ করছে তৃণমূলী পার্টিতন্ত্র, সেই মডেলেই খুন-জখম-জবরদখল ইত্যাদি চলছে প্রবল বিত্র(মে, সত্যি-মিথ্যে গুলিয়ে দিয়ে। আর মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিগুলি একে একে ভেসে যাচ্ছে (মতায়নের ঘোলা জলে। ''বামফ্রন্টের বিরোধিতা— বামপন্থার নয়''— মমতাময়ী এ দৃপ্ত ঘোষণাকে পদদলিত করে দলীয় কর্মীরা বামপন্থার প্রতীক লাল পতাকা দেখলেই তেড়ে যাচ্ছে উন্মত্ত যণ্ডের মতো, বি(বিদ্যালয়ের আলোচনাসভাতে কার্লমার্কস্-এর উল্লেখ পর্যন্ত বি( োভের মুখে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। নিষিদ্ধ হচ্ছে ধর্মঘট ও বন্ধ— ঠিক জ(রি অবস্থার মতোই। পর্যালোচনার ভিত্তিতে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি(র প্রতিশ্রুতিও কার্যকর হচ্ছে না— কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আপত্তিতে মুক্তি(যোগ্য হিসেবে চিহ্নি(ত বন্দীদের মুক্তি(র নির্দেশও বাতিল হয়ে যাচ্ছে (১৯৭৭-এ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আপত্তি মানেন নি!)। তার ওপর পর্যালোচনার নামে চাপিয়ে দেওয়া দেওয়া হচ্ছে চরম অপমানকর কার্যত 'মুচলেকা'র শর্ত। জঙ্গলমহল থেকে প্রতিশ্রুতিমতো যৌথ বাহিনী প্রত্যাহৃত তো হয়ইনি, উপরন্তু চিদাম্বরম-বুদ্ধ মডেল তথা প্রতিশ্রুতিকেই মূলত আবার নোতুন মোড়কে পরিবেশন করা হচ্ছে। আর ঠিক যেমন ঘটেছিল ১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার সময়— বামফ্রন্ট বিরোধিতার ঐতিহ্যসম্পন্ন নাগরিক সমাজের অনেকেই প্রত্য(ভাবে চেপে বসেছিলেন বামফ্রন্টের ব্যান্ড-ওয়াগনে— ঠিক তেমনি আজও, বামপন্থী, মানবাধিকার ও নাগরিক আন্দোলনের গণতান্ত্রিক দাবিগুলিতে সোচ্চার সামনের সারির কিছু মানুষও নীতি-আদর্শ ও লাল-লজ্জা বিসর্জন দিয়ে চেপে বসেছেন মমতা-রথের ওপরে। জঙ্গলমহল থেকে বন্দীমুক্তি( সব কিছুতে গণআন্দোলনের পথ ছেড়ে নতুন সরকারের উপর সর্বাত্মক নির্ভরতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন। সত্যি করে ভেবে দেখুন তো এরকম সম্ভাবনাই কি ছিল না।

প্র( অবশ্য একটাই গতানুগতিক বাস্তবতার চেনা ছকটাকে তছনছ করে দেবার উপযোগী সঠিক পথে পরিচালিত গণআন্দোলনের জন্য ব্যাপক মানুষকে আর কতদিন অপে( া করে থাকতে হবে?

# ঘ ট না প্র বা হ

## লিবিয়া নিয়ে মিথ্যাচার চলছেই

লিবিয়ায় সাম্রাজ্যবাদীদের সশস্ত্র আগ্রাসন অব্যাহত থাকলেও, দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, আগ্রাসীরা নিজেরাও তাদের এই অন্যায় অভিযানের সাফল্য সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ছে।

তার উপর আগ্রাসীদের লিবিয়া সম্পর্কিত ধারাবাহিক মিথ্যে প্রচারের অধিকাংশ ফানুসই দুই সুপরিচিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও হিউম্যান রাইটস্‌ ওয়াচ তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবে(ণের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছে। তাদের এই মিথ্যাচার এক দশক আগে ইরাক আত্র(মণ-পূর্ববর্তী মিথ্যাচারকেও ছাড়িয়ে গেছে বলে এই দুই সংস্থার অভিমত।

সাম্রাজ্যবাদীরা অভিযোগ তুলেছিল গদ্দাফির নির্দেশে লিবিয়ার সৈন্যবাহিনী হেলিকপ্টার থেকে নিরীহ নিরস্ত্র নাগরিকদের উপর আত্র(মণ চালাচ্ছে, ফলে বহু মানুষের মৃত্যু ঘটছে। সরকারি বাহিনীর আত্র(মণে হাজার হাজার লিবিয়াবাসীর মৃত্যুর 'খবর' প্রচারিত হয়েছিল। এই সব অভিযোগের ভিত্তিতেই তারা নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে লিবিয়কে 'নো ফ্লাই জোন' ঘোষণা করার প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেয় এবং তার প্রে(িতে নাটোবাহিনী অন্যায়ভাবে লিবিয়াতে আকাশপথে আত্র(মণ শু( করে। মানবাধিকার সংস্থা দুটির তদন্তে ধরা পড়ছে হেলিকপ্টার থেকে আত্র(মণের সামান্যতম প্রমাণ মেলে নি। যুদ্ধে তখনও পর্যন্ত মোট ১১০ জনের মৃত্যুর তথ্য মিলেছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে সরকারি ও বিরোধী দু'প(েরই লোক ছিল।

অভিযোগ উঠেছিল পেট্রোডলারের জোরে লিবিয়া সরকার আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে ভাড়াটে সৈন্য জোগাড় করে তাদের দিয়ে লিবিয়ায় যুদ্ধ চালাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ভায়াগ্রা খাইয়ে তাদের যৌনউত্তেজনা বাড়িয়ে মহিলাদের গায়ের জোরে ধর্ষণ করাচ্ছে। সংবাদ-মাধ্যমে এই প্রচারের প্রতিত্রি(য়ায় বহু দেশ থেকে আবেগপূর্ণ প্রতিবাদ ও নিন্দাবাদের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। মানবাধিকার সংস্থা দুটি জানাচ্ছে, সেই অভিযোগের কোনো প্রমাণ মেলে নি। সে খবর কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়ন্ত্রিত সংবাদ-মাধ্যমে জায়গা পায় নি। অনেকেরই মনে পড়বে, ইরাকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের সময় সংবাদ-মাধ্যমের সামনে অশ্রু(দ্ধ কণ্ঠে কুয়েতের জনৈকা নার্সের বয়ানে কীভাবে ইরাকি সৈন্য কর্তৃক হাসপাতালে ভর্তি অন্তত ৩০টি শিশুকে হত্যার 'কাহিনী' প্রচারিত হয়েছিল, এবং পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছিল, সবটাই ছিল সাজানো, আর সেই 'নার্সটি' আসলে ছিল কুয়েতের স্বৈরতন্ত্রী রাজপরিবারেরই এক রাজকন্যা। সেই মিথ্যাচারেরও কোনো তথ্য পরে প্রকাশিত হয় নি।

অর্থাৎ লিবিয়া সরকারের বি(দ্ধে অমানবিকতা ও নিষ্ঠুরতার অধিকাংশ অভিযোগই আসলে সাম্রাজ্যবাদীদের মিথ্যে প্রচার– অথচ সেই মিথ্যাচারের ভিত্তিতেই নাটোবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছে লিবিয়ার উপর। লিবিয়ার রেড ত্রি(সেন্ট সোসাইটির প্রদত্ত তথ্য অনুসারে, ন্যাটোর বিমান হানায় অন্তত ১১০০ নাগরিকের মৃত্যু ঘটেছে, যাদের মধ্যে ৪০০জন শিশু ও নারী। মারাত্মক আহতের সংখ্যা ৬ হাজারেরও বেশি।

এমন কথা মনে করার কারণ নেই যে, গদ্দাফির শাসনকালে লিবিয়াতে গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বর্গভূমি রচিত হয়েছে। কিন্তু তিনি অন্তত প্রতিবেশী দেশ আত্র(মণ করেন নি ইজরায়েলের মতো( দেশের ল(াধিক মানুষের মৃত্যু ঘটান নি ১৯৯০-এর দশকের আলজেরিয়ার মতো( প্রতি সপ্তাহে শ'খানেক মানুষের মৃত্যু ঘটাচ্ছেন না সিরিয়ার মতো( কিংবা প্রায় সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেন নি সৌদি আরব-সহ অধিকাংশ আরব দেশের মতো।

ফলত, সাম্রাজ্যবাদীদের আত্র(মণের ল(্যবস্তু হবার যোগ্যতা তার চেয়ে বেশি আর কার আছে!

দীপ্র চৌধুরী

## মিশরে বিপ-ব পিছু হটছে?

গত ফেব্রুয়ারির মিশরের যে বিপ-বী গণ-অভ্যুত্থান সমগ্র আরব দুনিয়াতে অভূতপূর্ব এক মে(ঝড়ের সূচনা করেছিল, তার পরিণতিতে সে দেশে মোবারকের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটলেও, এখনও পর্যন্ত মিশরে কিন্তু শাসকশ্রেণীই মূলত (মতার রাশ ধরে আছে। বিপ-বের মধ্যে দিয়ে প্রাথমিকভাবে যাদের হাতে (মতা এসেছিল, সেই সেনাবাহিনীই ছিল মোবারকের সমস্ত দুষ্কর্মের ধারক ও বাহক। মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদীরা দীর্ঘদিন ধরে তাদের অর্থ, প্রযুক্তি( ও প্রশি(ণ দিয়ে বশংবদ করে রেখেছে এবং বস্তুত তারাই ছিল মিশর বিপ-বে সাম্রাজ্যবাদীদের ট্রয়ের ঘোড়া। যে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই ওই বিপ-বের পটভূমি তৈরি করে দিয়েছিল, তাদের সংহতি ও সঠিক দিক্‌নির্দেশের ভিত্তিতে নেতৃত্বকারী সংগঠনের বিকাশের উপর নির্ভর করছিল এই ঘোড়া ও তার প্রভুদের উৎপাটনের মাধ্যমে প্রকৃত সমাজবিপ-বের পতাকা প্রোথিত হবার সম্ভাবনা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই সংহতি ও সঠিক দিক্‌নির্দেশ-ভিত্তিক সংগঠন গড়ে ওঠে নি, এবং ফলত বিপ-বের অগ্রগতি সুনিশ্চিতভাবেই ব্যাহত হচ্ছে।

বিপ-বের এই পশ্চাদপসরণের ভিত্তি স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল বিপ-বের প্রাথমিক বিজয়ের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাড়াহুড়ো করে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে গণউদ্যোগের অনুপস্থিতিতে মূলত সেনাবাহিনী ও মুসলিম ব্রাদারহুডদের মাতব্বরদের তৈরি সাংবিধানিক সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণের মধ্যে দিয়ে। (মতা পেয়েই আসন্ন নির্বাচনের টোপ ঝুলিয়ে দিয়ে সামরিক শাসকেরা

দেশের শাসকশ্রেণী ও আন্তর্জাতিক পুঁজির স্বার্থে চেষ্টা শু( করেছিল গণ-আন্দোলনের জোয়ারকে স্তিমিত করে দেবার জন্য, অনুসৃত হয়েছিল কিছু দমনমূলক ব্যবস্থাও। সামরিক শাসনের চাপিয়ে দেওয়া সেই বিধি-নিষেধ ও দমনমূলক ব্যবস্থার বি(দ্ধে তথা সেনাবাহিনী ও মুসলিম ব্রাদারহুডের বি(দ্ধে বিরাটভাবেই ফেটে পড়েছিল বি(োভের ব্যাপক কর্মসূচি। গণসংগ্রামের তীব্রতা বাড়তে থাকায় চাপে পড়ে যাচ্ছিলো সামরিক শাসকেরা। মিছিল-মিটিং নিষিদ্ধ করেও ফল হচ্ছিলো না, সংগ্রামী মানুষ প্রতিনিয়ত সেই নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করছিলো। এরই চরম প্রকাশ ঘটেছিল ৮ এপ্রিল— মিটিং-মিছিল নিষিদ্ধ করে জারি করা নতুন সামরিক আইনের বি(দ্ধে, এবং জ(রি অবস্থা দীর্ঘায়ত করার ও মুবারকের প্রতি নমনীয় অবস্থানের ইঙ্গিতেরও বি(দ্ধে তাহিরি স্কয়ারে হাজার হাজার ছাত্র, মহিলা ও এমনকি ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির বি(োভ-সমাবেশের মধ্যে দিয়ে। শাসকশ্রেণী স্পষ্টতই বিপদ গুনেছিল, তারা প্রস্তুতি শু( করে নতুন চত্র(ান্তের।

২৯ জুলাই মুসলিম ব্রাদারহুড, সালাফিপন্থী ও আল-গামা-আল-ইসলামিয়া প্রভৃতি চরম প্রতিত্রি(য়াশীল মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলি 'স্থিতিশীলতা'-র অজুহাতে সামরিক শাসনের প্রধানের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিরাট এক মিছিল সংগঠিত করে। বিপ্-বের প্রথম পর্যায়ে শাসকশক্তি(র দমন-নিপীড়নে নিহত শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ আগস্ট তাহিরি স্কয়ারে আয়োজিত শান্তিপূর্ণ গণ-অবস্থান ভেঙে দেওয়া হয় সামরিক ট্যাংক পাঠিয়ে। সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের দেশি তাঁবেদাররা এবং ইসলামিক মৌলবাদীরা ছাড়াও সেনাবাহিনীর এই সব দমনমূলক কার্যকলাপের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে তথাকথিত উদারপন্থীরা ও আপাত-বামপন্থী মধ্যবিত্তদের একাংশ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট অতি সম্প্রতি মুসলিম ব্রাদারহুড-এর সাথে 'খোলাখুলি আলোচনা'-র প্রস্তাব দিয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যে প্রতিত্রি(য়াশীলদের প্রধান পান্ডা সৌদি আরব দু'হাতে টাকা ঢালছে গণ-জাগরণের বি(দ্ধে।

মিশরের শ্রমিকশ্রেণী এই মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছে এক সন্ধি(ণে। বিপ্-বের প্রাথমিক বিজয়কে সংহত করতে হলে আরও গভীর ও সামাজিক তাৎপর্যপূর্ণ কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করাটা যে জ(রিভাবে আবশ্যিক, তা নিয়ে বিতর্ক না থাকলেও, তার মূল দিক্‌নির্দেশ কী হবে— তা নিয়েই রয়েছে নানা সংশয় ও দ্বন্দ্ব। ফলত নেতৃত্বকারী সংগঠন এখনও গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। তাত্ত্বিক মূল প্র(্নটিরও বাস্তবভিত্তিক সমাধান সুদূরপরাহত রয়ে গেছে। রাশিয়ার সামাজিক-অর্থনীতিক বাস্তবতার প্রে(িতে বিপ্-বের রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণের সমস্যাটি অনুধাবন করে তার সঠিক দিক্‌নির্দেশ রচনা করার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল লেনিনের মার্কসবাদী তাত্ত্বিক প্রাজ্ঞতার। চীনের অন্য রকম সামাজিক-অর্থনীতিক বাস্তবতার প্রে(িতে দরকার হয়েছিল মাও সেতুং-এর প্রাজ্ঞতার। মিশর বা আরব দুনিয়ার সামাজিক-অর্থনীতিক বাস্তবতার সঙ্গে রাশিয়া বা চীনের সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই সম্ভবত বেশি। সেখানে সমাজ-বিপ্-বের রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণের সমস্যাটি সমাধানের উপযোগী তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে না তোলা পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃত অর্থে অগ্রগতির পথ চিহ্নি(ত করা সুনিশ্চিতভাবেই খুব সহজ হবে না।

**প্রবীণ রায়**

---

## শ্যামলী খাস্তগীর প্রয়াত

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী নিউক্লিয়ার বিরোধী আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী, শিল্পী শ্রীমতী শ্যামলী খাস্তগীর স্বল্প রোগভোগের পর ১৫ অগাস্ট ২০১১ কলকাতায় প্রয়াত হলেন। শান্তিনিকেতনে খোয়াই বাঁচানোর আন্দোলন, বি(্বভারতীকে দুর্নীতিমুক্ত( করা, জমি নিয়ে প্রান্তিক অঞ্চলে জমি ফাটকাবাজি ইত্যাদি নানান ত্রি(য়াকলাপে সম্পৃক্ত( ছিলেন সবার প্রিয় শ্যামলীদি। পরিবেশ র(া আন্দোলনের এই সচেতন কর্মী বিদেশেও আন্দোলনের কারণে কারাবরণ করেছেন। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের থেকে ইচ্ছামতী বাঁচাও আন্দোলন— সর্বত্র ছিলো তাঁর প্রবল উপস্থিতি। প্রয়াত পান্নালাল দাসগুপ্ত-র টেগোর সোসাইটি আন্দোলনেও তিনি যুক্ত( ছিলেন। যদুগোড়ার ইউরেনিয়াম খনিতে কর্মরত কর্মীদের উপর তেজস্ক্রি(য়তার প্রভাবের নানান স্থিরচিত্র সহকারে তাঁর অসাধারণ বক্ত(তা অনেককে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর প্রয়াণে *অনীক* শোকপ্রকাশ করছে।

## অমল রায় প্রয়াত

প্রখ্যাত নাট্যকার অমল রায় সম্প্রতি প্রয়াত হলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ক্যান্সারে ভুগ-ছিলেন। অমল রায় ছিল তাঁর ছদ্মনাম, আসল নাম তপন কুমার দাস। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় তিনি বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। যোগ দেন নকশালবাড়ি আন্দোলনে। সেই পটভূমিকায় প্রতিবাদী নাট্যকার হিসেবেই তিনি দ্রুত পরিচিত হয়ে ওঠেন। প্রায় ৪০০টি নাটক তিনি রচনা করেন, তার মধ্যে অধিকাংশই একাঙ্ক। এগুলির মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে *কেননা মানুষ, শববাহকেরা, পথ বেঁধে দিল, গ্যাব্রিয়েল পেরি, নো পাসারন* প্রভৃতি। ব্যাপক মানুষের মধ্যে লড়াইয়ের চেতনা প্রসারে এগুলি সে সময় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। তাছাড়া, বাংলা নাটকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে একটি বিশেষ গু(ত্বপূর্ণ প্রবন্ধও তিনি রচনা করেন। গণমানসে চেতনা-সঞ্চারী এই লড়াকু মানষটির মৃত্যুতে *অনীক* গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক শোক প্রকাশ করছে।

প্রবন্ধ

# অধিকারের রাজনীতি ও রাজনীতির অধিকার

নীলাঞ্জন দত্ত

*কে হায় হৃদয় খুঁড়ে*
*বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!*
(*হায় চিল* জীবনানন্দ দাশ)

তখনও দেশে জ(রি অবস্থা ঘোষিত হয়নি। কিন্তু হাজারে হাজারে মানুষ রাষ্ট্রবিরোধী রাজনীতি ও বিভিন্ন গণ-আন্দোলন করার অপরাধে জেলে রয়েছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নকশালপন্থী বন্দীদের সংখ্যা, ১৭ মার্চ ১৯৭৩-এর *আনন্দবাজার পত্রিকা* অনুসারে ১৭,৭৮৭। এটা রাজ্য বিধানসভায় তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য। চারদিকে প্রচণ্ড রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস।

তার মধ্যেই বন্দীমুক্তি( আন্দোলনও চলছিল। কিন্তু আজকের তুলনায় সেদিন বন্দী অনেক বেশি থাকলেও বন্দীমুক্তি( আন্দোলনে লোক কি তেমন বেশি ছিল?

১৯৭৪ সালের ১৭ মে থেকে ১৪ জুন আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, প্রেসিডেন্সি জেল ও মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে রাজনৈতিক বন্দীরা অনশন করলেন। তাঁদের সমর্থনে কলকাতার এসপ্-ানেড ইস্ট-এ অবস্থান ও অনশন হলো। সেখানে দাঁড়িয়ে 'বন্দীমুক্তি(র কবি' বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেখলেন

সামনে, পিছনে, ডানে, বাঁয়ে
মাত্র কয়েকটি পুরনো মুখ
আর যারা, একেবারেই কিশোর
আর যারা, জেলের অন্ধকারে বহুদিন হারিয়ে
যাওয়া শিশুগুলির কেউ মা, কেউ বোন...

(*মিছিলে* বাহবা সময় তোর সার্কাসের খেলা)

আজও ছবিটা প্রায় একই রয়ে গেছে। অধিকারের জন্য অনেক মানুষ লড়াই করে ঠিকই, কিন্তু মানুষের অধিকার নিয়ে কথা বলবার মতো লোক সব দেশে, সব কালে কমই থাকে। যদিও তাদের থাকতেই হয়। কারণটা রবীন্দ্রনাথ এইভাবে বলে গেছেন ''দেশকে নিরন্তর পীড়ন হইতে বাঁচাইবার জন্য এক দল লোকের তো বুকের পাটা থাকা চাই, অন্যায়কে তারা প্রাণপণে প্রমাণ করিবে, পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিবে।'' (*কর্তার ইচ্ছায় কর্ম*)

এরই মধ্যে কখনও কখনও সময় তার সার্কাসের খেলা দেখায়। আজ যখন রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি(র দাবিতে মিছিল, অবস্থান, অনশন, বি( ভ হয়, তখন আশেপাশে তাকিয়ে অতি-পরিচিত, পুরনো মুখগুলিরও কয়েকটিকে খুঁজে পাইনা আর। 'ফ্রেন্ডস অব ডেমোত্রে(সি' নামে অধুনা-গঠিত একটি সংগঠনের প্রকাশিত 'রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি( মানবাধিকারের রাজনীতি, না মানবাধিকার নিয়ে রাজনীতি?' পুস্তিকায় এই বাস্তবেরই স্বীকৃতি মিলছে

আমাদের পরিচিত বৃত্ত ও তার বাইরেও এমন কী সংবাদমাধ্যমেও বেশ ভালো রকম প্রচারিত হয়েছে যে, উত্ত( বিষয়ে নানা মানবাধিকার/গণসংগঠনের সত্রি(য় নেতৃত্বের মধ্যে মতবিরোধ ঘটেছে।

নিঃশর্তে রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি(র প্র্ন্ে কোনো মতবিরোধ নেই। নীতিগতভাবে সবাই একমত। তাহলে বিরোধ হচ্ছে কোথায়? পদ্ধতিগত প্র্ন্ে। তথ্য বিকৃতির প্র্ন্ে। আন্দোলনের বিশেষ ঝোঁক/প্রবণতার প্র্ন্ে। ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে বর্তমানের তুলনার প্র্ন্ে। বাস্তব পরিস্থিতিকে নির্মোহভাবে বি(-ষণ করার বা না করার প্র্ন্ে।

বিরোধটা কোথায় হচ্ছে, এ প্র্ন্ে যাওয়ার আগে, বিরোধটা কেন হলো তা নিয়ে একটু ভাবা যেতে পারে। এই সেদিনও যারা একসঙ্গে হাঁটছিলাম, আজ কেন তাদের পায়ের ছন্দ মিলছে না? এর মধ্যে এমন কী ঘটেছে? সময় কোন্ সার্কাসের খেলা দেখিয়েছে? আমরা তো সামান্য মানুষ, *হাজার চুরাশির মা*-র নন্দিনীর মতো বলতে পারিনা, কোনও কিছুই পাল্টায় নি। স্বীকার করতেই হয়, 'পরিবর্তন' একটা ঘটেছে বটে। কোথায়? সরকারে। চৌত্রিশ বছরের বামফ্রন্ট সরকার ভোটে উল্টে গিয়ে এসেছে তৃণমূল কংগ্রেস-কংগ্রেস সরকার। এবং একটা ধাঁধার জন্ম হয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে অনেক অত্যাচার-অবিচার হয়েছে। লোকে তার প্রতিবাদও নিজের-নিজের মতো করে করেছে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে আবার তাদের আরও বেশি অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে। অনেকে প্রাণ দিয়েছে, অন্যরা জেলে গিয়েছে। এখন মানুষ তাকে সরিয়ে দিয়ে নতুন যে সরকার এনেছে, তার কাছে স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রত্যাশা যে এবার এইসব অত্যাচারের একটা প্রতিবিধান হবে, যারা প্রতিবাদ করতে গিয়ে জেলে আছে তারা ছাড়া পাবে, যাদের মাথায় মামলার খাঁড়া ঝুলছে তারা রেহাই পারে, যাদের ওপর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে তাদেরও নিষ্কৃতি দেওয়া হবে।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার আসার সময়েও এই প্রত্যাশা ছিল। কারণ তার আগে, কংগ্রেসি আমলেও, অত্যাচার কম হয়নি। প্রতিবাদও কম হয়নি। বন্দীমুক্তি( আন্দোলন চলছিলই। জ(রি অবস্থার শেষ দিকেই— এপিডিআর তখনও নিষিদ্ধ সংগঠন— গড়ে উঠেছিল বন্দীমুক্তি( কমিটি, যা লোকসভা নির্বাচনের কিছুদিন পরেই, ৭ এপ্রিল ১৯৭৭, কলকাতার স্টুডেন্ট হলে এক কনভেনশনে 'বন্দীমুক্তি( ও গণদাবী (প্রস্তুতি) কমিটি' নামে আত্মপ্রকাশ করে। আন্দোলন, মিছিল, অবস্থান, কোনও কিছুই নতুন সরকার আসার অপে( ায় থেমে থাকেনি। বামফ্রন্ট (মতায় আসার আগেই তাকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সরকারের এসে তাকে প্রথম কোন্ কর্তব্য পালন করতে হবে। বহু লিটল ম্যাগাজিন— যারা এক ঐতিহাসিক পর্যায় জুড়ে

পশ্চিমবঙ্গের বিবেকবান বুদ্ধিজীবীদের প্রায় একমাত্র প্রকাশমাধ্যমের ভূমিকা পালন করেছে— সেই সময় তাদের মলাট বা শিরোনামের ওপরে জ্বলজ্বলে অ( রে লিখে রাখত "সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি( চাই"। দেওয়ালে দেওয়ালে তখন এই (-াগানটা ফুটে উঠতে শু( করেছে। এই লেখাগুলো পড়তে পেরেছিল বলেই ভোট চাইবার সময় বামফ্রন্ট তার কর্মসূচির মধ্যে রেখেছিল "মিসা আইনের অবলুপ্তি এবং সাজাপ্রাপ্ত, বিচারাধীন ও বিনাবিচারে আটক সমস্ত রকমের বন্দীদের মুক্তি(" (বামফ্রন্টের কর্মসূচী, পৃ ৬)।

তা সত্ত্বেও, তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার আর কেন্দ্রের জনতা পার্টির সরকার উভয়েই আইনি-বেআইনি বহু টালবাহানা করেছিল। এবং তাদের বারবার মনে করিয়ে দিতে হয়েছিল যে এ বিষয়ে তারা জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সুতরাং উপদেশ নয়, নীতিবাক্য নয়,
আবেদন নয়, প্রার্থনা নয়,
ল( ল( বুকের খোলা উনুনে টগ্‌বগ্ টগ্‌বগ্ করে ফুটছে
**দাবি**।

**দাবি**—
এই নিরন্ন স্তব্ধ মধ্যরাত্রির উদারতায় নীল ন( ত্রের
কোটি কোটি মশাল জ্বালানো মুক্ত( আকাশের নীচে
ভারতবর্ষ নামক এই বিশাল নিখুঁত ভাবে নির্যাতীত
মনুষ্যত্বগ্রাসী জেলখানা থেকে
সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী সহ
সমস্ত গরীব মানুষের শর্তহীন
মুক্তি( চাই।

('মানুষের অধিকার' মণিভূষণ ভট্টাচার্য( ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *মানুষের অধিকার* কবিতা বুলেটিন থেকে)

আর এখন, একই কারণে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে একই ভাবে এই কথাটা মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যখন, তখন ফ্রেন্ডস্ অব ডেমোক্রে(সি সহ নতুন সরকারের বন্ধুরা "১৯৭৭ সালে বামপন্থী ফ্রন্ট রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি(র জন্য কোনো কমিটি তৈরি করেনি?" "ঢালাও মুক্তি(র আদেশ কি রাজবন্দীদের মুক্তি(র প্রক্রি(য়াকে ত্বরান্বিত করেছিল? বা সরকারের টালবাহানা ছিল না?" ইত্যাদি এমন সব প্র( তুলছেন, যেন মনে হয় যে আমরা আগের সরকারের হয়ে সাফাই গাইছি। এর মধ্যে ১৪ জুলাই ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে বন্দীমুক্তি( কমিটির এক কনভেনশনে এক প্রখ্যাত নাট্যকার তো বলেই গেলেন, দেখতে হবে বন্দীমুক্তি( কমিটির মধ্যে এমন লোকেরা ঢুকে পড়েছে কিনা, যারা বামফ্রন্ট সরকারের পতনে ঠিক ততটা খুশি নয়, এবং এইভাবে আন্দোলন করে নতুন সরকারকে খানিকটা বেকায়দায় ফেলে একটু তৃপ্তি পেতে চাইছে।

'ফ্রেন্ডস অব ডেমোক্রে(সি' তাদের পুস্তিকার প্রথম দিকেই আমার ১৯৮৫ সালের একটা লেখা উদ্ধৃত করে "কেন্দ্রের জনতা সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের টালবাহানার আচরণ"-এর উদাহরণ দিয়ে তাদের যুক্তি(র স্বপ( সা(ী টেনেছেন। আমার লেখাটা ছিল ইংরেজিতে। এখানে উদ্ধৃত অংশটা আমিই বাংলা করে দিচ্ছি

> ১৯৭৮-এর মার্চে, "গণতন্ত্র পুন(দ্ধারের" এক বছর পরেও, পশ্চিমবঙ্গে ১২৪ জন সাজাপ্রাপ্ত এবং ৪৮ জন বিচারাধীন রাজনৈতিক বন্দী থেকে গিয়েছিল। এদের সবাইকে মুক্তি( দিতে আরও বছরদুয়েক লেগেছিল, এবং তা কখনোই হতো না— **যদি না** সরকারের ওপর বন্দীমুক্তি( আন্দোলনের লাগাতার চাপ থাকত।

*(ভায়োলেশন অফ ডেমোক্রে(টিক রাইট্‌স ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল সিন্স ইনডিপেন্ডেন্স*, বম্বে সি জি শাহ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, ১৯৮৫)

এখানে 'যদি না' শব্দবন্ধটার ওপর জোরটা জুড়ে দিলাম। কেননা, এটাই বোধহয় আমাদের বন্ধুদের চোখ এড়িয়ে গেছে (ইংরেজিতে ছিল, "but for the consistent pressure brought upon the government by the prisoners' release movement")

জোর না দিয়ে বললে আজকাল অনেক কথাই দেখি অনেকের বোধগম্য হয়না, তাই আরেকটু জোর দিয়েই ব্যাপারটা বলি। কে বলেছে টালবাহানা ছিল না? অবশ্যই ছিল। কংগ্রেস সরকারের ছিল, জনতা সরকারের ছিল, বামফ্রন্ট সরকারের ছিল, তৃণমূল সরকারেরও আছে। রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি(র প্র( সব সরকারেরই টালবাহানা থাকে— কারণ তারা সরকার। রাষ্ট্রকে র( া করবার মহান দায়িত্ব তাদের ওপরে বর্তায়। তাই জনগণের অধিকারের স্বপ( , রাষ্ট্রের জিম্মাদারদের বি(দ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে যারা জেলে গেছে তাদের মুক্তি( দিতে তাদের দশবার ভাবতে হয়।

কারণ ওরা ধৈর্যহারা ত(ণ দেশব্রতী,
ছাড়লে ওদের শাসক শোষক স্বৈরাচারীর ( তি।

('বন্দী করে রাখলো শুধু ওদের' বিমলচন্দ্র ঘোষ, *মানুষের অধিকার*)

বারবার কবিতার কাছে ফিরে যাচ্ছি বলে যারা বিরক্ত( হচ্ছেন তাঁদের কাছে ( মা চেয়ে নিচ্ছি। তবু, '৭৭ সালের সেই কবিকণ্ঠগুলির থেকে স্পষ্ট করে এসব কথা বোঝানোর মতো আর কোনও মাধ্যম আমার জানা নেই। আচ্ছা, বলুন তো, সেই সময় যদি 'উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রা'র কবি বুঝতে পেরে থাকেন, তবে আজ আমাদের বন্ধুদের বুঝতে বাধা কোথায়?

নতুন কালের প্রতিশ্রুতি ভাঙতে কোথায় বাধা?
সর্বকালের শাসকদলের এক সুরে সুর সাধা।

(বিমলচন্দ্র ঘোষ ঐ)

ব্যাপারটাতে সোজা। টালবাহানা ছিল, আন্দোলনও ছিল। টালবাহানা ছিল, তাই আন্দোলন ছিল। আন্দোলন ছিল, তাই বন্দীমুক্তি( হয়েছিল, টালবাহানা সত্ত্বেও। আন্দোলন থাকলে বন্দীমুক্তি( হবে, টালবাহানা সত্ত্বেও।

**এর পর ১০ পৃষ্ঠায়**

**প্রবন্ধ**

# খুচরো ব্যবসায় বিদেশি লগ্নি

**সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়**

সাধারণ দোকানদার, তাদের কর্মী, ছোট দোকানের মাল সরবরাহকারী, এমনকি পাইকারি ব্যবসাদার, আড়তদার, চাষির জীবন থেকে ছোট ও মাঝারি শিল্প সংস্থাগুলিতে একটা বড় আঘাত আসতে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে— বিদেশের বিপুল অর্থের মালিক বড় বড় সংস্থা এবার থেকে তাদের বাজারে ঢুকে কেনাবেচা করতে পারবে। বিভিন্ন পণ্যের খুচরো ব্যবসার বিপণীতে তারা ৫১ শতাংশ পর্যন্ত মালিকানা রাখতে পারবে। এর ফলে খুচরো ব্যবসার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত দেড় কোটি দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। জীবিকা হারাতে পারে ১৬ কোটি মানুষ। এমনকি পাইকারি ব্যবসা থেকে আড়তদার, ছোট চাষি থেকে ছোট কারখানা মালিকদের বাজারে টিকে থাকাও দায় হতে পারে বলে একইভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সংসদের বিশেষ স্ট্যান্ডিং কমিটি (যারা সরকারের এই বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনার দায়িত্বে ছিল)। দেশের সব বিরোধী দল, অর্থনীতিবিদ্‌দের একাংশের আপত্তি অগ্রাহ্য করে, খুচরো দোকানদারদের জাতীয় স্তরের সংগঠনের অনুরোধকে উপেক্ষা করে কেন্দ্র এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রটিকে যত সামান্য ভাবা হয় আসলে মোটেই তা নয়। এর সঙ্গে জড়িত কৃষি, শিল্প, এমনকি আন্তর্জাতিক রাজনীতিও। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের পিছনে রয়েছে দেশের কর্পোরেট লবির একাংশের সমর্থন। রয়েছে মার্কিন প্রশাসনের বারংবার 'অনুরোধে'র চাপও। এই নিয়ে অনেকদিন ধরেই দেশের ভিতরে-বাইরে সক্রিয় মার্কিন লবির পক্ষ থেকে লাগাতার চাপ আসছিল। বাধা দিচ্ছিল দেশের বিরোধী দলগুলি। বামেদের প্রবল আপত্তিতেই প্রথম ইউপিএ সরকারের পক্ষে এ নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয় নি। বিজেপি-ও মাল্টি ব্র্যাণ্ডের খুচরো ব্যবসায় কোনোভাবেই বিদেশি লগ্নি মেনে নেবে না বলে জানিয়েছিল। জয়ললিতার মতো রাজ্য স্তরের বিভিন্ন দলগুলিও ছিল বিপক্ষে। যেহেতু খুচরো ব্যবসাটি মূলত রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়, কেন্দ্রে এবং রাজ্যে শাসক কংগ্রেসের একার পক্ষে বিদেশি সংস্থার পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছিল না। তবু বারবার বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, বিশ্বব্যাঙ্কের মতো আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি সংস্থার মাধ্যমে পরামর্শ আর মার্কিন প্রশাসনের অনুরোধ উপেক্ষা করে কিছুই না করার মতো দৃঢ় অবস্থান নিতে ব্যর্থ কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত দেশবাসীর জীবনে সংকট ডেকে এনেই বিদেশি পুঁজিকে আহ্বান জানিয়ে মার্কিন প্রশাসনকে সন্তুষ্ট করার রাস্তা নিল।

আসলে মন্দা-পরবর্তী পরিস্থিতিতে গত দু'বছরে ভারতীয় অর্থনীতির মৌল ক্ষেত্রগুলিতে দেখা দিয়েছে অশনি সংকেত। গত বছরের তুলনায় চলতি ২০১১-১২ সালে কৃষিতে বৃদ্ধির হার অর্ধেকের বেশি কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩ শতাংশে। কমেছে শিল্পবৃদ্ধির হার। ভাটার টান পরিষেবা ক্ষেত্রগুলিতেও। সব মিলিয়ে চলতি ২০১১-১২ সালে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি যে বাজেটের ৯ শতাংশের ধারে কাছ দিয়েও যাবে না তা জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা গোষ্ঠী, এমনকি মর্গান স্ট্যানলির মতো বিখ্যাত বিদেশি 'ওয়াচ-ডগ'রা। ফলে হুড়হুড় করে কমে যাচ্ছে এদেশের রেটিং— কমছে বিদেশি লগ্নি আসার পরিমাণ। বিদেশি সংস্থার বিনিয়োগ গত বছরের তুলনায় অর্ধেক হয়ে গেছে। শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণটুকু এখনও এ বছর বেড়ে রয়েছে। এই অবস্থায় এখনই যদি বিমা, পেনশন, খুচরো ব্যবসার মতো ক্ষেত্রগুলির দরজা (যার দিকে বহুদিন ধরেই বিদেশি সংস্থাগুলি তাকিয়ে) বিদেশি বিনিয়োগের জন্য খুলে দেওয়া না যায় তাহলে কখনই ঘুরে দাঁড়ানো যাবে না। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা কৌশিক বসুর এই পরামর্শ মেনেই খুচরো ব্যবসায় বিদেশি লগ্নিকে স্বাগত জানাতে উদ্যোগী হন খোদ প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী। বিভিন্ন মন্ত্রকের সুস্পষ্ট আপত্তি ও এনিয়ে নানা বিষয়ে পাল্টা বক্তব্য থাকলেও তা নিয়ে বিকল্প সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করা হয় নি। বরং গত জুলাইয়ে ভারত-মার্কিন কৌশলগত বৈঠকে দিল্লিতে এসে মার্কিন বিদেশ সচিব হিলারি ক্লিনটন এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতেই মার্কিন প্রশাসনকে সন্তুষ্ট করতে ক্লিনটনের আমেরিকা ফেরার আগেই তড়িঘড়ি ভারত সরকার এই চরম সর্বনাশা সিদ্ধান্তটি প্রায় একতরফাভাবেই ঘোষণা করল।

সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিবাদের কথা মাথায় রেখে কেন্দ্র অবশ্য এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে কতগুলি শর্ত জুড়ে দিয়েছে। শর্তগুলি হল—(১) যে ৩৫টি শহরে দশ লাখের বেশি মানুষের বাস সেখানেই কেবলমাত্র এই বিদেশি লগ্নি স্বাগত; (২) কমপক্ষে ১০ কোটি বা ১০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে হবে; (৩) বিদেশি বিনিয়োগের অর্ধেকটা খরচ করতে হবে 'ব্যাক এণ্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার' বা কোল্ড স্টোর তৈরির মতো পরিকাঠামো তৈরির জন্য; (৪) স্থানীয় ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলি থেকে ৩০ শতাংশ পণ্য কিনতেই হবে; (৫) পাইকারি বা খুচরো বেচাকেনা যেভাবেই হোক, ৩০ শতাংশ বেচাকেনা করতে হবে ছোট বা খুচরো দোকানিদের সঙ্গে।

অর্থাৎ এই বিদেশি নির্মাণে লগ্নি যাতে খুচরো ব্যবসাকে সংগঠিত ক্ষেত্র হিসেবে তৈরি করতে পরিকাঠামো নির্মাণে কাজে লাগে তার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থা বা স্থানীয় ছোট খুচরো দোকানিদের বাঁচানোর জন্য ৩০ শতাংশ

পণ্য কেনা বা বেচার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, সরকার সব প(ের কথা ভেবেই এসব ভাবনা ভেবেছেন। কিন্তু সমস্যা হল সরকারের টিকি তো বাঁধা দেওয়া বি(েবাণিজ্য সংস্থার কাছে। তাই সবশেষে বলেছে— এসব শর্ত যদি বি(ে বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি(র সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তবেই বিদেশি সংস্থাগুলি তা মানতে বাধ্য হবে। বিদেশি সংস্থাগুলির ভারতীয় লবি যথারীতি অখুশি। সংগঠিত খুচরো ব্যবসার প্রতিনিধি রিটেলার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার সিইও কুমার রাজাগোপালাম জানিয়েছেন, "খুচরো ব্যবসায় বিদেশি লগ্নির সিদ্ধান্তটি স্বাগত। তবে এত শর্ত সাপে( বিদেশিরা উৎসাহী নাও হতে পারে।" অন্যদিকে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে সঙ্কটের আশঙ্কা করেই কিষান জাগৃতি মঞ্চের নেতৃত্ব জানাচ্ছেন যে কৃষকের স্বার্থ র(ায় যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া না হলে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে খুচরো ব্যবসায় বিদেশি লগ্নি হলে (তিগ্রস্থ হন কৃষকেরাও। শেষ পর্যন্ত এই সর্বনাশা সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে বাধা দিতে দেশব্যাপী আন্দোলনের পথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কনফেডারেশান অব অল ইন্ডিয়া টেড্রার্স। সংগঠনের সে(ে(টারি জেনারেল প্রবীণ খান্ডেনওয়াল একথা জানিয়ে বলেছেন, এজন্যে তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থন চাইছেন, চাইছেন রাজ্য সরকারগুলির সহায়তাও। ইতিমধ্যেই বামপন্থী দল ও তাদের শ্রমিক সংগঠনগুলি সর্বাত্মক আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিজেপি আগেও আন্দোলন করেছিল। এবার কতখানি সি(য় ভূমিকা নেয় সেটাও দেখার।

সব মিলিয়ে মাল্টি ব্রাণ্ডের খুচরো ব্যবসায় বিদেশি লগ্নি নিয়ে ফের প্রতিবাদ-আন্দোলনে পুরনো বিতর্কের মধ্যে থেকেই কতগুলি গু(ত্বপূর্ণ প্র(ে উঠে আসছে—

(১) খুচরো ব্যবসায় বিদেশি লগ্নি বা বৃহৎ পুঁজি কতখানি আশঙ্কার?

(২) সরকারি যুক্তি(র সারবত্তা কতখানি?

(৩) বিদেশিরা আসতে চায় কেন?

(৪) এই সিদ্ধান্তের পিছনে অর্থনৈতিক কূটনীতিতে মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্র ও ভারতের অবস্থান কী?

এই প্র(েগুলি নিয়ে আলোচনার আগে খুচরো ব্যবসা নিয়ে কয়েকটি গু(ত্বপূর্ণ তথ্য ও বক্ত(ব্য তুলে ধরা প্রয়োজন।

এদেশে খুচরো ব্যবসার (ে(টি কেবলমাত্র আরও একটি অর্থনৈতিক (ে( নয়, সামাজিক জীবনেও এর গু(ত্ব অপরিসীম। আর্থিক দিক থেকে দুর্বল, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেশিরভাগ মানুষ, যারা সংগঠিত (ে(ে কর্মসংস্থান পান নি কিংবা কোনও না কোনওভাবে কর্মহীনতার শিকার হয়েছেন তারাই এই (ে(টিতে খুবই অল্প পুঁজি নিয়ে বাড়ির সামনে বা পাড়ার গলির মুখে বা বাজারে ছোট একটি দোকানে সারাদিন কেনাবেচা করে কোনও মতে জীবিকা অর্জন করেন। এই শ্রেণীর দোকানদার ছাড়াও এইসব দোকানে যারা অতি অল্প বেতনে কাজ করেন কিংবা মাল সরবরাহকারী কিংবা রাস্তার পাশের হকার বা বাজারের সব্জি বা ফল বি(ে(তা এরা প্রায় সকলেই দারিদ্র্যসীমার খুব কাছাকাছি অবস্থায় জীবন ধারণ করেন। এই মানুষগুলোর উন্নতির জন্য কোনও দিন কেন্দ্রীয় বা কোনও রাজ্য সরকার এই খুচরো ব্যবসার উন্নয়নে কোনও পদ(েপ নেন নি। বরং এরাই দেশের অর্থনীতিতে কোটি কোটি টাকার কেনাবেচা করে দেশকে সমৃদ্ধ করেছে, অথচ নিজেরা দিনের পরদিন রিক্ত( হয়েছে সরকারি ঔদাসিন্যে। এই খুচরো ব্যবসার (ে(টি তাই রয়ে গেছে চূড়ান্ত অসংগঠিত অবস্থায়। বহু স্তরে স্তরে ছড়ানো, তবু সব মিলিয়ে চলতি বছরেও এই (ে(ের সংগঠিত অংশে প্রায় ১৮০ কোটি ডলারের ব্যবসা হয়েছে। সংগঠিত-অসংগঠিত সব মিলিয়ে ধরলে ৫৯০-৬৫০ কোটি ডলার ব্যবসা হয় বছরে। এদেশের মোট অভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদনের ১০ শতাংশ আসে এখান থেকেই। শুধু তাই নয়, কৃষির পরে এদেশের সব থেকে বেশি মানুষ এই (ে(টির সঙ্গে যুক্ত(। দেশের কর্মসংস্থানের ৮ শতাংশ হয় এখানেই। এজন্যে সংসদের স্থায়ী কমিটি বলেছিল সরকার যেন এই (ে(টিতে কখনই বিদেশি লগ্নিকে স্বাগত না জানায়। কারণ, বিদেশি সংস্থাগুলি এলে এরা প্রতিযোগিতা করে নিজেদের বাজার ধরে রাখতে পারবে না। ফলে ধনে-প্রাণে শেষ হয়ে যাবে অনেকেই।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির এই আশঙ্কা অমূলক ছিল না। একটি সমী(া করে দেখা গেছে ভারতের সবথেকে বেশি বড় বড় মল ও সুপারমার্কেট যেখানে, সেই বাঙ্গালোর শহরের ছোট দোকানগুলিতে কেনাবেচা কমে গেছে ১৫-৩০ শতাংশ। একই অবস্থা হয়েছে চণ্ডীগড়ে, আমেদাবাদে, দেশের অন্য বড় অনেক শহরে। এসব শহরে সব থেকে (তিগ্রস্থ হয়েছে রাস্তার পাশের হকাররা। উদারনীতির গত বিশ বছরে সর্ব(ে(ে সব থেকে (তিগ্রস্থ হয়েছে দেশের গরীব মানুষরা। এ(ে(েও তাই হবে। শুধু ভারতে নয়, এই একই ঘটনা প্রত্য( করে এখন খুচরো ব্যবসায় বিদেশি লগ্নি ও বৃহৎ পুঁজির উপর নিয়ন্ত্রণ জারি করেছে চিলি থেকে চীন, আর্জেন্টিনা থেকে মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ডের মতো অতি ছোট দেশ থেকে শু( করে মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্রের মতো অতি বৃহৎ অর্থনীতিও। খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশে বিরূপ প্রতিি(য়া হয়েছে। তাই খোদ মার্কিন মুলুকেই বিভিন্ন শহরের পৌর কর্তৃপ( এখন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ খুচরো বিপণী মার্কিন সংস্থা ওয়ালমার্টের লাইসেন্সই নবীকরণ করতে চাইছে না। দেখা গেছে, ওয়ালমার্ট যেহেতু মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্রের ফল ও সবজির বাজারের ৯২ শতাংশই দখল করে নিয়েছে, সে দেশের ছোট দোকানগুলি (মম অ্যাণ্ড পপ স্টোর নামে যা পরিচিত) বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে। আরও সমস্যা দেখা দিয়েছে। ওয়ালমার্ট চীনের বাজার থেকে সস্তায় নানা পণ্য তৈরি করে আনায়।

মার্কিন শিল্প(ে ত্রে চাহিদা কমেছে( গত ১০ বছরে মার্কিন শিল্পে ৩৪ শতাংশ উৎপাদন কমার পিছনে ওয়ালমার্টের ভূমিকাও গু(ত্বপূর্ণ বলে এখন সেদেশেরই নীতি নির্ধারকরা আপত্তি জানাচ্ছেন। অথচ সেই ওয়ালমার্টকেই ভারতীয় খুচরো বাজারে ঢোকানোর জন্যে বারবার অনুরোধ জানাচ্ছে মার্কিন প্রশাসন।

কেন্দ্রের এই দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার সব জেনেও এসব তথ্য ভুলে যান কোনও অজ্ঞাত কারণে। যারা চীনের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলে সে দেশ তো খুচরো ব্যবসায় ১০০ শতাংশ বিদেশি লগ্নির অনুমতি দিয়েছে, তারা কি জানে যে, এজন্যে চীন নিজেকে, নিজের দেশের (ে ত্রকে, তৈরি করেছে প্রায় বিশ বছর ধরে। প্রথমে তারা বি(েবাণিজ্য সংস্থার চুক্তি(তে সই করে নি। দেশের খুচরো ব্যবসার (ে ত্রটিকে সরকারি পরিকল্পনা আর মানুষের উদ্যমকে কাজে লাগিয়ে বি(েমানের প্রতিযোগিতায় স( ম করে তুলেছে। তারপর ১৯৯২ সাল থেকে ধীরে ধীরে একটু একটু করে এই (ে ত্রে বিদেশি পুঁজিকে স্বাগত জানিয়েছে এবং বিদেশি পুঁজির সঙ্গে পাল্লা দিয়েই দেশের (ে ত্রকে সংগঠিত ও দ( করে তুলেছে। এখন চীনা (ু দ্র শিল্প(ে ত্রের পণ্যে ছেয়ে গেছে মার্কিন বাজারও। ভারত এ পথে হাঁটলে তো সমস্যা ছিল না। এ নিয়ে বিতর্ক শু( হয়েছে ২০০০ সাল থেকেই। তখন থেকেও যদি যথাযথ পরিকল্পনা নিয়ে এ দেশের ছোট চাষি, ছোট উদ্যোগী, ছোট দোকানিদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ঋণদান, ভর্তুকি, সককারি সাহায্য, বিপণন ও রপ্তানিতে সরকারি সাহায্যের মাধ্যমে বিদেশিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় স( ম করে তোলার ব্যবস্থা করা হত, সেইভাবে খুচরো ব্যবসার (ে ত্রে অভ্যন্তরীণ সংস্করণ করা হত, তাহলে সমস্যা ছিল না। কিন্তু এখন সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত রয়েছে ভারতীয় খুচরো ব্যবসার (ে ত্রটি। এখন যদি সেখানে ওয়ালমার্ট, কস্টকো, টেসকোর মতো বিদেশি সংস্থাগুলির প্রবেশ ঘটে এবং তারা যেভাবে 'ওয়ালমার্ট মডেলে' ব্যবসা চালায় সেইভাবেই আগ্রাসনের নীতিতে ভারতীয় সহযোগী সংস্থাকেও পরিচালিত করে তাহলে এদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবনে চরম সংকট ঘনীভূত হবে। এনিয়ে সন্দেহ নেই।

**'ওয়ালমার্ট মডেল'—নয়া উপনিবেশের রূপ**

উদারনীতির হাত ধরে বি(ায়ন-পরবর্তী সময়ে পৃথিবী জুড়ে যে মার্কিন আধিপত্য তাকে কাজে লাগিয়েই মার্কিন সংস্থা এবং মার্কিন লবিভুক্ত( দেশগুলির বহুজাতিক সংস্থাগুলি বিভিন্ন দেশে ব্যবসার মাধ্যমে সেই দেশের অর্থনীতির মজ্জারস শুষে নেয়। ফলে সেদেশের সাধারণ মানুষের জনজীবনে নেমে আসে তীব্র জীবনসংগ্রাম এবং কর্মচ্যুতির আশঙ্কা। এইভাবেই মার্কিন মদতে ত্র(মপ্রসারিত বি( বাণিজ্য ব্যবস্থায় খুচরো বিত্রি(র (ে ত্রে মহাশক্তি(ধর সর্ববৃহৎ সংস্থা ওয়ালমার্ট। পৃথিবীর ১৫টি দেশের ৫৫টি শহরে সাড়ে আট হাজার বিপণী খুলে এরা বাঁধাকপি থেকে কম্পিউটার সবই এক ছাদের তলায় এনে বেচে। পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত থেকে সব থেকে সস্তায় মাল কিনতে এরা চুক্তি(তে চাষ করায়, চুক্তি(তে পণ্য উৎপাদন করায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতোই প্রচুর অর্থের জোরে এরা যেমন আগাম 'দাদন' দিয়ে অনেক কমে মাল কেনে, তেমনই বেচেও বাজার ছাড়া কম দামে। ওয়ালমার্টের বোর্ডে লেখা থাকে 'সর্বদাই কম দাম'। কম দামের ধাক্কাতেই বাজার থেকে গুটিয়ে যায় অন্য ছোট সব দোকান ও মাঝারি মাপের দেশীয় সংস্থাগুলি। কারণ, বিদেশি বহুজাতিকদের পুঁজির যা জোর তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির ছোট ও মাঝারি দোকানিদের প( কেন অনেক কর্পোরেটের প( ও অসম্ভব। সারা বছরে ওয়ালমার্ট যা আয় করে তা সাব-সাহারান ১০টি দেশের মোট আয়ের সমান। ওয়ালমার্ট-এর বাৎসরিক আয় ১ ল( ৯০ হাজার কোটি ডলার। যে কোনও দেশের বাজারে প্রবেশের কিছুদিনের মধ্যেই এরা একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে ফেলে শুধু অর্থের শক্তি(তে। তারপর ধীরে ধীরে রাষ্ট্রশক্তি(কেও কাজে লাগায় ব্যবসার সম্প্রসারণে। একদা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতোই এরা অর্থের জোরে চাষিকে বাধ্য করে চুক্তি(তে চাষ করতে, আবার রাষ্ট্রশক্তি(কে ব্যবহার ক'রে সেই অমানবিক চুক্তি(-চাষকে আইনসম্মত করে তোলে। ইতিমধ্যেই ওয়ালমার্ট ভারতে খাদ্যশস্যের রপ্তানির বাজারে প্রবেশ করে দ( ণ ভারতে এই চুক্তি( চালু করে দিয়েছে। ভারতের কৃষি(ে ত্রে ইতিমধ্যেই শু( হয়েছে মার্কিন ঔপনিবেশিক শক্তি(র দাপট। বি(ের উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলিতে উন্নত পুঁজিবাদী দুনিয়ার বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থাগুলি এই 'ওয়ালমার্ট মডেলেই' সত্রি(য় হয়েছে বি( বাণিজ্য ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে। এই মডেল অনুসরণ করে গত দশ বছরে ফুলে ফেঁপে উঠেছে ব্রিটেনের টেসকো, জার্মানির মেট্রো, জায়ান্ট, কেয়ারকোর ইত্যাদি নানা সংস্থা। এরা যতই ফুলে ফেঁপে উঠেছে ততই শুকিয়ে গেছে সে দেশের সাধারণ খুচরো দোকানিরা।

**সরকারি যুক্তি(র অন্তঃসারশূন্যতা**

এতদ্ সত্ত্বেও সরকার নিজে এবং এদেশে বিদেশি পুঁজির সমর্থকরা উদারনীতিতে জনকল্যাণের ঢক্কানিনাদ শোনাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বি(েব্যাঙ্কের বেঁধে দেওয়া সেই একই কথা ও সুরের গতে তারা মুক্ত( বাণিজ্যের নামে বিদেশি পুঁজির জয়গান গাইছেন। যুক্তি( সেই একই— শুধু একা কয়েকটি ওয়ালমার্টের মতো সংস্থা কম দামে মাল বেচলেই নাকি দেশের মুদ্রাস্ফীতি কমে যাবে। তাছাড়া বিদেশি লগ্নি মানেই উন্নত বিদেশি প্রযুক্তি( বা জ্ঞান এবং সর্বশেষে সেই প্রচুর কর্মসংস্থানের স্বপ্ন বিলানো। গত বিশ বছর ধরে এই যুক্তি( আর প্রতিশ্রুতি শুনতে শুনতে মানুষ বুঝে গেছে কোনটা সত্যি আর কোনটা বোকা বানানোর চালাকি। ওয়ালমার্টরা জিনিসের দাম কমিয়ে বিত্রি( করে সীমিত সময়ের জন্য— যতদিন না প্রতিযোগী বিপণীগুলি বাজার ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়, ততদিনই। তারপরই বাজারে কার্যত

একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হলে ইচ্ছেমতো দাম বাড়ায়-কমায়। তখন (তিগ্রস্থ হয় ত্রে(তারাই। তারা অর্ডার দিয়েও ইচ্ছেমতো পণ্য সরবরাহকারীদের কাছ থেকে মাল কম কেনে, চুক্তি(ও ইচ্ছেমতো বাতিল করে, দামও মেটায় ইচ্ছেমতোই। বাজারে বিকল্প কেউ থাকে না বলে পেটের তাগিদেই এই অমানবিক শোষণ মেনে নিতে হয়।

বিভিন্নভাবেই নানা(ত্রে শোষণের এক বিস্তৃত জাল ছড়িয়ে গোটা স্থানীয় অর্থনীতিকে মুনাফা বৃদ্ধির প্রয়োজনে ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। শ'য়ে শ'য়ে মানুষ বেকার হয়ে যায়। ২০০ টাকায় যে জামা বিত্রি( করে, তার সেলাইয়ে দর্জিকে দেয় ২ টাকা। এরপরেও মুক্ত( বাণিজ্যের নামে স(মতা বৃদ্ধির দোহাই দিয়ে, প্রযুক্তি( আমদানির 'গল্প' শুনিয়ে বিদেশি পুঁজির সমর্থক অর্থনীতিবিদ্-রাজনীতিকরা বলেন— ওইসব সংস্থা এলে লাভ হবে দেশের মানুষের। তারা কাজ পাবে। ২০১০-এর জুলাইয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক খুচরো ব্যবসায় বিদেশি লগ্নি নিয়ে একটি বিস্তারিত আলোচনা ও গবেষণাপত্রের সংগ্রহের আয়োজন করেছিল। সেখানে যেসব 'পেপার' জমা পড়েছিল তাতে দেখা যাচ্ছে খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির যত বেশি লগ্নি হয়, ততই এই ব্যবসার বিভিন্ন স্তরে কর্মহীনতা বাড়তে থাকে। ঐসব বড়ো সংস্থায় একজন কর্মীর নিয়োগ হওয়ার আগে সমাজে ৪২ জনের কর্মচ্যুতি ঘটে। সেই হিসেবে দিল্লির পলিসি ফর অল্টারনেটিভ-এর সমী(ায় একটি হিসেবে দেখা গেছে, এদেশের ৩৫টি বড় শহরে ওয়ালমার্ট যদি তাদের শাখা খোলে, তাহলে সব ক'টি শাখা মিলিয়ে মোট কর্মসংস্থান হবে ১০ হাজার ১৯৫ জনের, আর সেই এলাকায় সং(-ষ্ট বিভিন্ন (ত্রে কর্মহীন হয়ে পড়বেন ৪ লাখ ৩২ হাজার মানুষ!!

এতো গেল কর্মসংস্থানের কথা। খুচরো বাজারে বিনিয়োগ এমন কিছু বিদেশি মুদ্রা দেশে লগ্নির প্রয়োজনে আসে না যে তাতে এদেশের অর্থনীতিতে কোনও বিশেষ ছাপ পড়বে। না আছে এই (ত্রের বিশেষ কোনও বৃহৎ কৌশল যার জন্যে ভারতের প্রযুক্তি((ত্র ও গবেষণা উপকৃত হতে পারে। তাহলে কার স্বার্থে এসব যুক্তি(র অবতারণা? আসলে সবই এদেশের বিত্তবান মানুষের দিকে তাকিয়ে। তারা ইউরোপীয় স্টাইলে মার্কিন আর ইউরোপীয় সংস্থার ভোগ্যপণ্য কিনবে। দেশ উন্নত বি(ের কাছাকাছি পৌঁছাচ্ছে বলে একটা শহুরে ইমেজ গড়ে উঠবে। আর দেশের কর্পোরেট জগতের যারা খুচরো ব্যবসা থেকে বিশাল অঙ্কের মুনাফা কামাতে চান, তারা বিদেশি বহুজাতিকের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে গড়ে তুলবেন বড় বড় সুপারমার্কেট। কারণ একা একা তো তারা অনেকেই চালাতে পারছেন না, দেশের শিল্পপতিদের চেইন স্টোরগুলো অনেক শহরে বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক শহরে ধুঁকতে ধুঁকতে চলছে। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বহু মাল্টিপে-ক্সও। এমত অবস্থায় বৃহৎ বিদেশি লগ্নির সাহায্যে খুচরো দোকানদারদের একেবারে বাজার থেকে সরাতে না পারলে কায়েমি স্বার্থ (ুণ্ণ হচ্ছে। রাজনীতিক-কর্পোরেট যোগসাজসে সরকারি (মতাকে ব্যবহার করে দেশে সর্বসাধারণকে কোণঠাসা করে এলিট শ্রেণীর প্রতিষ্ঠার জন্যেই খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজিকে ডেকে আনা হচ্ছে। উল্লেখ করা উচিত যে, এই এলিট শ্রেণীর পরিধি দু'দশকের উদারনীতিতে অনেক বিস্তৃত হয়েছে। বিত্তবান শ্রেণী ছাড়াও এর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে গ্রামের সম্পন্ন চাষি, শহরের উচ্চবিত্ত ও সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা উচ্চাকাঙ(ী সচ্ছল মধ্যবিত্ত। এরা মুষ্টিমেয় হলেও অল্পবিস্তর সকলেই উদার অর্থনীতির সুফল পেয়েছেন। এদের আকাঙ(া আর মূল্যবোধে বি(ায়নের স্পর্শে মার্কিন আনুগত্য— তারই আধারে দেশের নীতি নির্ধারণে রাজনীতি যে পথে আবর্তিত হচ্ছে, সমাজের প্রান্তিক মানুষরা যূথবদ্ধ সংগঠিত প্রতিবাদ না করতে পারলে এলিট-আকাঙি(ত পশ্চিমী অনুকরণের পথ থেকে সরকারকে সরিয়ে আনা শক্ত(। খুচরো বাণিজ্যে বিদেশি পুঁজির ধারক-বাহক ম্যাকডোনাল্ডস-ওয়ালমার্ট সংস্কৃতি। গণমাধ্যমকে গ্রাস করে বৃহৎ পুঁজি ওই সংস্কৃতির প্রচার চালায় প্রতিনিয়ত। পেটে টান না পড়লে এই মায়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসা শক্ত(। একদিকে প্রচুর 'মল', 'সুপারমার্কেট', অন্যদিকে বুভু( মানুষের অর্ধাহারে দিন যাপন। আগামী দিনে কোন্ ভারতকে নিয়ে বাঁচতে চাই তাও বুঝে নিতে হবে এই প্র(ের মধ্যে থেকেই— দেশের অসংগঠিত খুচরো ব্যবসাকে সংগঠিত করতে আরও ঋণদান, পরিকাঠামোগত সাহায্য, রপ্তানির জন্য বিশেষ ছাড় ও বিপণনে সরকারি উদ্যোগে সাহায্য করার রাস্তায় হাঁটা হবে, নাকি ধীরে ধীরে দেশের কৃষি, (ুদ্রশিল্প, কুটির ও গ্রামীণ শিল্প ও পাড়ার দোকানগুলি বন্ধ করার জন্য আরও বেশি করে বৃহৎ পুঁজিকে খুচরো ব্যবসায় ডেকে আনা হবে।

**ভারতে ব্যবসা ও মার্কিন কৌশল**

একটা কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বিদেশিরা ভারতের মতো একটা দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশে কোটি কোটি টাকা লগ্নি করতে চাইছে কেন? আর বি(বাণিজ্যের নিয়ন্তা মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্রেরই বা অবস্থান কী? কৌশলগত বৈঠকের নামে তারা ভারতের কাছ থেকে কী চায়?

এ তিনটি প্র(ের উত্তরে বলা যায়— ভারতে ব্যবসার সম্ভাবনা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। যেহেতু বি( পুঁজির নিয়ন্তাদের হিসেবে বি(ের খুচরো বাজারে আগামী দিনে ভারতই হবে দ্বিতীয় আকর্ষণীয় বাজার। ব্যবসা হবে ২০২৫ সালে দেড় ট্রিলিয়ান ডলার। মুনাফা আর বাজারের শক্তি(র হিসেবে ভারতের আকর্ষণ এখন ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মান, অস্ট্রেলিয়ার থেকেও বেশি। তাই এখন থেকেই সেই বাজারকে যে কোনও মূল্যে করায়ত্ত করাই হচ্ছে প্রধান ল(্য। AT KEARNY-র মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরামর্শদাতা সংস্থার মতে, ভারতের বাজারটা অন্য সব বাজারের চাইতে আকর্ষণীয়। তাই মন্দায়

আত্র(াস্ত মার্কিন অর্থনীতি চাইছে এখন ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের বাজারগুলিতে নিজেদের আধিপত্য কায়েম ক'রে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে। তাই তাদের দেশের সংস্থাগুলির আরও বেশি মুনাফা যাতে হয় সেই ল(্যে বিদেশ নীতিকে সাজাচ্ছে। সেই মুনাফার ভারে ওবামা প্রশাসন এখন কর বসিয়েই প্রায় দেউলে হয়ে যাওয়া মার্কিন রাজকোষ ভরাট করতে চাইছে। এজন্যে তাদেরও মাল্টিব্রান্ডে চাই ভারতের মতো 'ভার্জিন মার্কেট'। 'ভার্জিন' এই কারণে যে এখনও এ দেশের বহুধা বিস্তৃত খুচরো বাজারটি চরিত্রগতভাবেই অসংগঠিত। নেই সংগঠিত বিদেশি সংস্থার উপস্থিতি। দেশী সংস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতা কম, মুনাফার সম্ভাবনাও তাই বেশি। এখানে বাজারে স্ট্যাগনেশান বা স্থিতাবস্থা আসাও অনেক দেরি। কৌশলগত বৈঠকে বসে হিলারি তাই স্পষ্টভাবেই ভারতীয় নেতৃত্বকে বোঝাতে চেয়েছেন যে, ভারতের খুচরো বাজারটা তাদের চাই। মার্কিন সংস্থাগুলি যেন দ্রুত প্রবেশাধিকার পায়। বিনিময়ে তারা ভারতকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আরও গু(ত্ব দিয়ে এশীয় অঞ্চলে, কী পূর্বে, কী দ(িণ-পূর্বে কিংবা পশ্চিমে নেতৃত্ব দেওয়ার রাস্তা করে দেবে। আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে, বিশেষত এশীয় অঞ্চলের (েত্রে, চীন এখন মার্কিনদের ঘাড়ের কাছে নিঃ(াস ফেলছে। তাদের সামাল দিতে আর অবাধ্য ইরানকে কোণঠাসা করে রাখতে ভারতকে এগিয়ে দেওয়া জ(রিই ছিল। অন্যদিকে মার্কিন তল্পিধারক হয়ে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতেও অধিকতর গু(ত্ব পাওয়ার অর্থ নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসন লাভে মার্কিন সমর্থনে এগিয়ে থাকা। এই পারস্পরিক বাটোয়ারার উদ্দেশ্যেই ঝোপ বুঝে কোপ মেরে চেয়েছেন হিলারি। কুশলী মার্কিন বিদেশ সচিব গত জুলাইয়ের বৈঠকেই ভারতের আর্থিক সংস্কার ত্বরান্বিত করতে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শু(র পদ(েপ হিসেবে বিমা, ব্যাঙ্কিং ও মাল্টিব্র্যান্ডের খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজির প্রবেশে আইনি ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেন। এদেশের গণতন্ত্র আম-আদমির ভোটে চলে, অর্থনীতির গোড়াটা ধরে রাখে তারাই। কিন্তু রাজনীতি নির্ধারিত হয় এলিট শ্রেণীর স্বার্থে। অর্থনীতি চালিত হয় কর্পোরেট স্বার্থে। মার্কিন বিদেশ সচিবের এই অনুরোধের সঙ্গে তাদের স্বার্থের সংঘাত নেই, বরং পরিপূরক উপাদানগুলির সাযুজ্যে ভারতের উন্নয়নের যে রোডম্যাপ তৈরি হয় তাতে ২০ শতাংশ ভারতবাসীর ইন্ডিয়া 'শাইন' করবেই। বাকি ৮০ শতাংশ মানুষের ভারত দারিদ্র্যের আরও অন্ধকারে তলিয়ে গেল কিনা তার খবর রাখার প্রয়োজন আছে কি?

এই প্র(ের উত্তর নিয়ে দেশের নীতিনির্ধারকরা ভাবেন না। তাই তাদের ভাবনায় বিদেশি পুঁজি মানেই স্বাগত। খুচরো বেচাকেনাতেও। এর চেয়ে বড়ো অভিশাপ আর কী আছে?

প্রান্তিক মানুষদের গণপ্রতিরোধ আর সংগ্রামই এই রোডম্যাপ বদলে দিতে পারে। জমি অধিগ্রহণের (েত্রে সারা দেশে যা হয়েছে খুচরো দোকানিরা কি তা পারবেন?

## অধিকারের রাজনীতি ও রাজনীতির অধিকার

**৫ পৃষ্ঠায় পর**

বুঝতে বাধা, না দ্বিধা?

এ দ্বিধা আমরা আগেও দেখেছি। আসলে '৮৫ সালের ওই পুস্তিকাটা লেখার কারণ ছিল এটাই। তখনও অধিকার আন্দোলনের কোনও কোনও কর্মীর মধ্যে এই দ্বিধা তৈরি হয়েছিল, এতদিন পরে কংগ্রেসের অপশাসন গিয়ে বামফ্রন্ট সরকারে এসেছে, এ তো তবু মন্দের ভালো ('lesser evil'), এখনই জোরদার আন্দোলন করতে দিয়ে তাকে বেকায়দায় ফেলা কি ঠিক হবে? এই দ্বিধার শরিক যারা হতে পারিনি, তারা সেদিন আন্দোলনের মধ্যে কারো দালাল খুঁজতে বেরোইনি, কিন্তু বিতর্কটা চালিয়ে গেছি, আন্দোলনটাও চালিয়ে গেছি। সেই সরকারও গিয়ে আরেক সরকার এসেছে, আন্দোলনটা রয়ে গেছে। অধিকারের রাজনীতি নিয়ে রাজনীতির অধিকার আমরা ছাড়িনি। ছাড়বো কেন? আবার 'হাজার চুরাশির মা'র নন্দিনীর কাছে ফিরে যাই— ''নাথিং হাজ এনডেড''।

তাই সেদিন যা লিখেছিলাম— যা ফ্রেন্ডস অব ডেমোত্রে(সির বন্ধুরা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন বলে মনে করেননি— আজ আবার তাই লিখি, বাংলা করে

> গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের কর্মীদের কাছে, অধিকারের কিছু মানদণ্ড, কিছু ধারণা থাকতে হবে, যা দিয়ে তাঁরা কোনও সরকারের কাজকর্মকে বিচার করবেন। তাঁরা কাউকে ব্ল্যাঙ্ক চেক দেবেন না। অন্য দিক থেকে দেখলে, কেউ যদি মনে করেন যে কোনও সরকার তুলনামূলকভাবে গণতান্ত্রিক, তাহলে সেই সরকারের দ্বারা গণতান্ত্রিক অধিকারের সামান্যতম লঙ্ঘন দেখলেই তাঁদের প্রতিবাদ না করার কোনও কারণ নেই। (ভায়োলেশন..., পৃ ৩৪)

তাই সেদিনও বীরেনদার যে ছোট্ট কবিতা পোস্টারে লিখতাম, আজও লিখবো

বন্দীমুক্তি( আজও কানামাছি খেলা?
অথবা লটারী? - কপালে জুটলে বাজী
ছাড়বেন তাকে কাজী!

পোড়াকপালের মেঘে মেঘে বাড়ে বেলা—
জেলের গরাদ সমানে ভেংচি কাটে।
বক্ত(তা দেন হুজুর গড়ের মাঠে

'হবে, সব হবে, একদিন সব হবে'...।
কবে? মহাশয়! কবে?

('বন্দীমুক্তি(', ৩ অক্টোবর ১৯৭৭)

হয়তো বড়জোর 'মহাশয়' শব্দটা পাল্টে 'মহাশয়া' করতে পারি। বাকিটা পাল্টাবো না। এটা আমাদের রাজনীতির অধিকার। কবিতারও।

প্রবন্ধ

# তদন্ত কমিশন— কিছু প্রাসঙ্গিক প্র{

সমরেশ মিত্র

৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসন হটিয়ে দিয়ে ৭৫ দিন কাজ চালনা করে বর্তমান তৃণমূল-কংগ্রেস জোট নয়-নয় করে দু দফায় ছ'টি তদন্ত কমিশনের কথা ঘোষণা করেছেন। এইসব তদন্ত কমিশনের বিচার্য বিষয়ের মধ্যে যেমন পূর্বতন বামফ্রন্ট জমানার অত্যাচারের ঘটনা রয়েছে, তেমনি রয়েছে কংগ্রেস আমলে 'বামপন্থী'-দের দ্বারা 'সংগঠিত' 'গণহত্যা'। কাশীপুর-বরানগর গণহত্যা-রও তদন্ত হবে বলে ঘোষিত হয়েছে, যদিও কোনও কমিশনই জনগণের জ্ঞাতার্থে সংবাদপত্রে আবশ্যিক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেনি।

যে সব ঘটনার জন্য তদন্ত কমিশন বসছে বলে খবরের কাগজের সূত্রে জানা গেছে, সেগুলির বৈচিত্র্য ল(্য করার মতো। দেখলেই মনে হবে যে এই ঘটনাগুলো বেছে নেওয়ার পেছনে কোনও দিশা নেই। যেমন বিডিও কল্লোল শূর-এর মৃত্যু, হুল-উৎসবের সময় ট্রাকের ধাক্কায় আদিবাসীদের মৃত্যু। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে সাঁইবাড়ি এবং কাশীপুর-বরানগর।

যে ছ'টি তদন্ত কমিশনের কথা শোনা গেছে, সেগুলি গঠনের পেছনে যে কোনও মূল নীতি নেই বরং খানিকটা তাৎ(ণিকতাই কাজ করেছে তা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যখন আমরা দেখি যে এই তালিকায় নেই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঘটনা, নেই রেশন কাণ্ডে নিহতদের জন্য কোনও তদন্ত কমিশন! এমনকি যে হত্যাকাণ্ডটি কেন্দ্র করে (কংগ্রেসি নেতা বিমলানন্দ রায়-এর হত্যা) তৃণমূল, মূল কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল সেই ঘটনারও উল্লেখমাত্র নেই। 'নেই'-এর তালিকা বিরাট এবং এক অর্থে তাৎপর্যপূর্ণও।

অবশ্য নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। আমরা তাই এই সমস্ত তদন্ত কমিশন গঠনকে স্বাগত জানাই। আমাদের খটকা শুধু একটা জায়গাতেই। যে 'অমানিশা'-র অবসানে আপাতত রাজ্য জুড়ে ফূর্তির জোয়ার, যাঁদের রক্ত( আর মৃত্যু পরিবর্তনের ভিত্তি প্রস্তুত করেছে, সেই অবহেলিত, অজ্ঞাত, অত্যাচারিত, ঘাতকের হাতে নিশ্চিহ্ন( মানুষদের জন্য সুবিচার চাওয়ার কোনও দাবি, ৌণ কণ্ঠস্বরও কেন শোনা যাচ্ছে না? তদন্ত কমিশন গঠনের যে সুস্থ প্রবণতা দৃশ্যমান, সেই প্রবণতাকে আরও সদর্থক করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের অত্যাচারিত এবং শহিদের পরিবারগুলির দীর্ঘ-দিনের দাবির একটা ছোট তালিকা পেশ করা এখন বোধহয় অসঙ্গত হবে না।

১৯৪৭ থেকে ২০১১। এই সুদীর্ঘ ৬৪ বছরের শাসনে মূলত তিনটি ঘরানার শাসন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রত্য( করেছে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত ছিলো একটানা কংগ্রেস ঘরানার একদলীয় শাসন। ছোটো ছোটো দুটি রাষ্ট্রপতির শাসনের মাঝে দুটি স্বল্পায়ু বহুদলীয় যুক্ত(ফ্রন্ট শাসন এবং ১৯৭২ সালের থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত আবার নব-কংগ্রেসের একচেটিয়া শাসন। তারপর ১৯৭৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত বামফ্রন্ট শাসন। সব মিলিয়ে ২৫ বছর কংগ্রেস শাসন এবং ৩৬ বছর বহুদলীয় যুক্ত(ফ্রন্ট-বামফ্রন্ট শাসন। এই দুটি আমলেই বারবার মানুষের মৃত্যু ঘটেছে রাষ্ট্রের প্রত্য( মদতে। ফলে ন্যায়নীতি, স্বাভাবিক ন্যায়বিচার এবং শুভবুদ্ধি-র দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি হত্যা-মৃত্যুই তদন্তের দাবি নিয়ে হাজির। আমরা নানা অতিপরিচিত, প্রমাণিত এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিস্মৃত কাহিনীগুলো সামনে এনে একটি সংহত দিশা থেকে তদন্ত কমিশন গঠন ও কমিশনের সুপারিশ দ্রুত কার্যকর করার জন্য বর্তমান সরকারের কাছে আহ্বান রাখছি।

১৯৪৭-এর পর পরই নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রবর্তনের বি(দ্ধে মিছিল সংগঠিত হলে বিধান রায় সরকারের পুলিশ নির্মমভাবে গুলি চালিয়ে হত্যা করে শিশির মন্ডলকে। স্বাধীন ভারতের প্রথম শহিদ শিশিরের হত্যার যথাযথ তদন্ত করে দোষী ব্যক্তি(দের অন্তত চিহ্নি(ত করে তাদের স্বরূপ জনসম( উদ্‌ঘাটন করা একটি পুণ্য কাজ। এর জন্য দায়ী পুলিশরা যদি কোনও পুরস্কার পেয়ে থাকে তো তাদের সেই পুরস্কার প্রকাশ্যে কেড়ে নেওয়া হোক।

বিধান সরণী-বৌবাজারের মোড়ে ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের শহিদদের বেদী রয়েছে। হত্যাকারীরা কে? এক নৃশংস ঘটনায় তিনজন মহিলা ও একজন হকার পু(ষ নিহত হলেন— বাংলার মানুষ এই হত্যাকারীদের চিনতে চায়।

সাঁইবাড়ি-র ঘটনা ঘটে ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে— যার রহস্য উদ্‌ঘাটনে একটি তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছে। কিন্তু সাঁই ভ্রাতৃবৃন্দের হাতে রবি ড্রাইভার হত্যা, রাজলক্ষ্মী দেবীর বাড়িতে হামলা, সাঁইবাড়ি নিয়ে গঠিত পূর্বতন একটি তদন্ত কমিশনে সা(্য দিতে এসে কমিশনের চোখের সামনে আততায়ীর হাতে গুণমণি রায়ের হত্যা— এগুলোর তদন্ত হলে তবেই তো পূর্ণাঙ্গ রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে, তদন্ত কমিশন বি{াসযোগ্যতা অর্জন করবে।

১৯৭০ সালের ১২ থেকে ২২ আগস্ট-এর কালাদিনগুলোর কথা দুর্গাপুর-সহ সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে আজও ভয়ঙ্কর স্মৃতি। এই দশদিনে দুর্গাপুর, অত্যাচারপুর-এ পর্যবসিত হয়েছিলো। ইস্পাত নগরীর কর্মীরা বিভিন্ন ন্যায়সঙ্গত দাবি এবং আত্মমর্যাদা র(ার জন্য যখন আইনসঙ্গত ধর্মঘটের অধিকার প্রয়োগ করেন তখন পুলিশ-সিআরপি বাহিনীর অত্যাচার নেমে

আসে, সঙ্গে যোগ দেয় নব-কংগ্রেসি গুন্ডা-হার্মাদরা। ২০শে আগস্ট সারা দুর্গাপুরে কারফিউ জারি হয়— বর্ধমান জেলা থেকে দুর্গাপুরকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। কর্মীদের বাসস্থান থেকে বাড়ির মহিলাদের রাস্তায় টেনে বের করে প্রহার সহ নানান লাঞ্ছনা করা হয়— ১০০ জন মহিলা গু(তর আহত হন। সাংবাদিকরাও হামলার শিকার হন, তাঁরা জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে প্রতিবাদ করেন। এই ঘটনার প্ররোচনাকারী একজন বর্তমান শাসকদলের নেতা— এখনও তিনি রিভলবার হাতে দেহর( সহ দুর্গাপুর শহর দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। যে অত্যাচারিতা মহিলারা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে দুর্গাপুরের রাস্তায় আপন খেয়ালে ঘুরে বেড়ান, তাঁদের স্বার্থেই সেদিনের ঐ কুৎসিত ঘটনার সঠিক তদন্ত হওয়া জ(রি।

১৬-১৭ নভেম্বর ১৯৭০ বারিদ সরকার এবং অশোক দত্তকে পুলিশ তুলে নিয়ে যায়। পুলিশ অফিসার প্রয়াত রণজিৎ ওরফে (ণু গুহনিয়োগী দুজনেরই বুকে গুলি করে। বারিদ অবি(াস্যভাবে বেঁচে যান, পুলিশ অশোকের লাশ গঙ্গার জলে মাঝরাতে ভাসিয়ে দেয়। বারিদ তৎকালীন মুখ্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটকে গুলিতে আহত হওয়া (তস্থান দেখান, বারিদের বোন পুলিশের বি(দ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন, অভিযোগ করেন অশোকের বাবাও। ভারতীয় ফৌজদারি বিধিমতে ৮ জন পুশিশের বি(দ্ধে মামলাও দায়ের হয়। খুনের মামলা যেহেতু তামাদি হয় না তাই এই মামলা পুনরায় চালু করা যেতে পারে। তদন্ত হলে আরও চাঞ্চল্যকর সব তথ্য উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। এর মাধ্যমে বর্তমানের অত্যাচারী পুলিশ অফিসারদের কাছে আইন মানার বার্তাও পাঠানো যায়।

আবার দুর্গাপুর। যে এমএএমসি কারখানার পুন(জ্জীবনের কথা বলে ইস্পাত নগরীতে মা-মাটি-মানুষের জয়জয়কার, সেই এমএএমসি হাইস্কুলের প্রধান শি( ক, শ্রী বিমলানন্দ দাশগুপ্তকে একদিন নব কংগ্রেস গুন্ডারা ঘিরে ধরে। তিনি নাকি তাঁর বিদ্যালয়ের প্র(পত্রে 'মুক্তি(সূর্য'-বিরোধী প্র( দিয়ে সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের 'কমিউনিস্ট' বানানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অনেক বাদানুবাদের পরে নব কংগ্রেসি যুবকবৃন্দ 'প্রিয়দা যুগ যুগ জীও' স্লোগান তুলে শ্রী দাশগুপ্তকে একটি ঘরে আটক করে ঘরটিতে বাইরে থেকে আগুন লাগিয়ে দেয়। শ্রী দাশগুপ্ত জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। সমগ্র ঘটনাটির নেতৃত্বে যিনি ছিলেন, সেই যুব নেতাটি এর আগে সাঁইবাড়ি মামলায় মিথ্যা সা( ্য এবং জাল নথি পেশ করার দায়ে আদালতের ধমক খেয়েছিলেন! এই ঘটনার পর বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণীর ছাত্র, তাদের অভিভাবক এবং শি( ক-অশি( ক কর্মচারীবৃন্দ একযোগে তদন্তের এবং দোষীদের শাস্তিদানের জন্য লিখিত আবেদন জানান। কোনও তদন্ত হয়নি। দেখা যাক্, শি( া(ে ত্রে 'দলতন্ত্রের অবসান'-এর পর এই প্রয়াত শি( ক বিচার পান কিনা।

১৯৭৩ সালের জুন মাসে মেদিনীপুরের গোধূলিয়া গ্রামে পুলিশের জিপে করে একদল যুব কংগ্রেসি মস্তান হানা দেয়। তারা গ্রামের মহিলাদের ওপর বিশেষভাবে নজর দেয়— ক্র(মাগত ধর্ষণের পর কয়েকজন নারী অচেতন হয়ে পড়লে তারা ধর্ষণের চিহ্( লোপাট করার জন্য স্থানীয় থানার সহায়তায় সব সা( ্যপ্রমাণ নষ্ট করে ফেলে। তখন মেদিনীপুরের জেলাশাসক ছিলেন প্রাক্ত(ন তৃণমূল সাংসদ শ্রী দীপক ঘোষ মশাই। তিনি প্রাথমিক তদন্ত করে প্রকাশ্যেই একজন স্থানীয় ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেস বিধায়কের বি(দ্ধে ঘটনাটি ঘটানোর জন্য প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ তোলেন। তিনজন নারী ধর্ষণের (তচিহ্( নিয়ে নানান লাঞ্ছনা-বঞ্চনা-সামাজিক অবিচার ভোগ করছেন। আমরা এই বিষয়ে যথাযথ তদন্তের দাবি পেশ করছি।

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন থেকে সিদ্ধার্থ রায়ের পরাজয়ের সময়কালে গণহত্যা নিয়ে যে পরী( া চলেছিলো, তার মধ্যে অধুনা বরানগর-কাশীপুরের কথা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এটি কোনও একক ঘটনা ছিলো না। অন্যান্য গণহত্যা বিস্মৃতির অতলে ডুব দিলেও সেগুলিও কিছু কম সাংঘাতিক নয়।

১৯৭০ সালের ১৯শে নভেম্বর রাতভোরে বারাসাত-আমডাঙার রাস্তায় ১১ জন যুবকের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ পাওয়া যায়। একথা সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে যে আড়িয়াদহ অঞ্চলের একজন কংগ্রেসি নেতার 'খুনের বদলা' নেওয়ার জন্য ঐ নেতার ভাইয়ের প্রত্য( মদতে এই গণহত্যা সংঘটিত করা হয়।

১৯৭১-এর প্রজাতন্ত্র দিবসের জন্য যখন রাজ্যবাসী ময়দানের কুচকাওয়াজ দেখছেন তখন ডায়মন্ডহারবারের গঙ্গার কাছে বস্তাবন্দী ৫টি মৃতদেহ পাওয়া যায়। আর একজন মৃতপ্রায় ব্যক্তি(কে পুলিশ উদ্ধার করে— ১৪টি বুলেটের (ত নিয়ে সে অল্প(ণ পরেই মারা যায়। মৃতদের বয়স ২৫ থেকে ২৭-এর মধ্যে। পুলিশ প্রথমে এই যুবকদের ডাকাত বলে প্রচার করে বলে যে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে এরা খুন হয়েছে। কিন্তু এদের শরীরে যে গুলি পাওয়া যায় সেগুলি ছিলো পুলিশের পিস্তলের, মৃতদেহগুলির হাত-পা বাঁধা ছিলো। পরে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ জানায় যে এই যুবকদের নামে পুলিশের খাতায় কোনো কেস নেই, তারা ফেরার নয় এবং পুলিশ তাদের খুঁজছিলো না!

১৯৭১ সালের ১ জুন কোন্নগরের কাছে একটি 'গণসমাধি' আবিষ্কৃত হয়। সর্বমোট ৯টি মৃতদেহ পাওয়া যায়, এদের মুণ্ড ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করা ছিলো। প্রত্যেকের গলায় আঘাতের চিহ্( ছিলো এবং তাদের মৃত্যুর কারণ ছিলো প্রহার। পুলিশ কী করে এই গণসমাধির কথা জানতে পারলো তা তারা পরিষ্কার করে জানায় নি। সন্দেহ হয়, এই ঘটনার নায়ক পুলিশই— পেছনে কংগ্রেসিদের মদত ছিলো। কেননা পুলিশ বলে যে তারা স্থানীয় এক যুব কংগ্রেসি নেতার কাছ থেকে গণসমাধির কথা জেনেছিল।

১৯৭১ সালের ৩/৪ আগস্ট রাতভোরে দ( ণ কলকাতার

রাজা বসন্ত রায় রোড-এর এক বাড়ি থেকে পুলিশ কোনও ওয়ারেন্ট ছাড়াই, কোনও অ্যারেস্ট মেমো বা নিরপে( সা(ীর উপস্থিতি ছাড়াই, কবি-সাংবাদিক-প্রাবন্ধিক সরোজ দত্তকে তুলে নিয়ে যায়। তারপর পুলিশ রটিয়ে দেয় যে তিনি নিখোঁজ। আসলে পুলিশ রাতভোরে ময়দানে তাঁকে গুলি করে হত্যা ক'রে তাঁর মৃতদেহ থেকে মাথা কেটে নিয়ে চলে যায়। অমৃতবাজার পত্রিকায় এই খবর বের হয়। বিখ্যাত অভিনেতা প্রয়াত উত্তমকুমার পুলিশের দ্বারা এই হত্যাকাণ্ড প্রত্য( করেছিলেন বলে জনশ্রুতি। সরোজ দত্ত, যিনি নির্মম এবং শাণিত ভাষায় সমাজের কুৎসিত রূপ উন্মুক্ত( করতেন, যিনি লুমুম্বার 'আফ্রিকার বুকে একটি সকাল' নামক এক অসামান্য কবিতার অনুবাদক, যিনি রোমা রোঁল্যা-র *শিল্পীর নবজন্ম* অনুবাদ করে বাঙালি পাঠকের কাছে রোঁল্যার অন্য রূপ তুলে ধরেছিলেন, উষালগ্নের একরাশ আলোর মাঝে ঘাতকের শাণিত অস্ত্রে ছিন্ন শির নিয়ে লুটিয়ে পড়লেন। বাঙালির সংস্কৃতির স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে এই বিষয়ে তদন্ত হওয়া জ(রি।

১৯৭১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর হাওড়ায় পুলিশ উর্দিপরা গুন্ডাদের নেতৃত্ব দিয়ে শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের হত্যা করে। নিহতদের সঠিক সংখ্যা জানা নেই। পরের দিনের দৈনিক সংবাদপত্রে পুলিশ এবং গুন্ডারা সাধারণ মানুষকে পেটাচ্ছে এমন ছবি বার হলেও দোষী ব্যক্তি(দের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়নি।

বিনা বিচারে আটক বন্দীরাও জেলের ভেতরে জেল কর্তৃপ( দ্বারা সংগঠিত বন্দীহত্যা থেকে রেহাই পাননি। মেদিনীপুর জেলে দু-দফা 'সংঘর্ষে' (১৬/১২/৭০ এবং ৪/২/১৯৭৯) মোট দশজন বন্দী নিহত হন। বহরমপুর জেলে তিন দফা 'সংঘর্ষে' (২৪/২/১৯৭১, ২০/২/১৯৭২ ও ২৬/১১/১৯৭২) ১০ জন নিহত হন, আহত হন ৭৫ জন। এর মধ্যে দ্বিতীয় দফাতে নিহত হন সম্ভাবনাময় সাহিত্যিক শ্রী তিমিরবরণ সিংহ, যাঁর স্মরণে তাঁর শি(ক কবি শঙ্খ ঘোষ লেখেন— 'নতজানু হয়ে কোলে তুলে নিই/তোমার ছিন্ন শির/তিমির।' দমদম সেন্ট্রাল জেলে (১৪/৫/১৯৭১) নিহত হন ১৫ জন, ঐ মাসের ১৬ তারিখ হাওড়া জেলে নিহত হন আরো কয়েকজন। ১১ জুলাই আলিপুর স্পেশাল জেল-এ ৫ জন বন্দীকে কারার(ীরা পিটিয়ে মারে। আর ২৬শে নভেম্বর ৬ জন মৃত্যু বরণ করেন, প্রায় ২০০ জন আহত হন। কারার(ী সমিতি বিবৃতি দেয় যে তৎকালীন জেল সুপারের প্রত্য( নেতৃত্বে এবং নির্দেশে এই ঘটনা ঘটেছে।

আসানসোল জেলে দু দফায় ১২ জন নিহত হন। ১৯৭২-এর ৭ ফেব্রুয়ারি হুগলি জেলে খুন হন কবি দ্রোণাচার্য ঘোষ। মে মাসে বর্ধমান জেলে ২ জন বন্দী খুন হওয়ার পর তৎকালীন কারামন্ত্রী শ্রী জ্ঞানসিং সোহনপাল বিধানসভায় বিবৃতি দিয়ে বলেন (*হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ড*, ৩১/৫/১৯৭২) যে, বর্ধমান জেলে বর্তমানে ১২৯৪ জন বন্দী রয়েছে। যদিও এই জেলে সর্বাধিক ৭২০ জন বন্দী থাকতে পারে।

হৃদরোগে গু(তর পীড়িত নকশালপন্থী নেতা শ্রী চা( মজুমদারকে পুলিশ কলকাতা থেকে গ্রেফ্‌তার করে ১৬ই জুলাই ১৯৭২। পুলিশের ক্র(মাগত জেরা, তাঁর শরীরের প্রতি ইচ্ছাকৃত উপে(া, তাঁর বি(দ্ধে একগুচ্ছ রাজনৈতিক মামলা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে সাধারণ কয়েদির মতো অপরিসর, হাওয়াহীন, অপরিচ্ছন্ন 'সেল'-এ রাখার ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই সময়ের বিভিন্ন সংবাদপত্রে তৎকালীন পুলিশমন্ত্রী (আজকের তৃণমূল বিধায়ক ও মন্ত্রী শ্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় মহাশয়) এবং মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি থেকে জানা যাচ্ছে যে, তাঁর সেল-এ পাখা না থাকায় ডাক্ত(ারের সুস্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করে তাঁকে হাসপাতালে না পাঠিয়ে সেলে-ই তাঁর জন্য পাখার ব্যবস্থা করা হয়। প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং অক্সিজেনের ব্যবস্থা করায় গাফিলতি (সম্ভবত ইচ্ছাকৃত) ছিলো। তা না হলে গু(তর পীড়িত অবস্থায় দীর্ঘ তিন বছর যিনি পলাতক জীবন যাপন করে বেঁচেছিলেন, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়-এর কথামতো 'জামাই আদরে থাকা' অবস্থায় মাত্র ১২ দিনের মাথায়, ২৮শে জুলাই ১৯৭২ তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা আগে তাঁকে হাসপাতালে অচৈতন্য অবস্থায় নিয়ে আসা হয়— তাঁর দেহ ফুলে গিয়েছিলো। তাঁর মৃতদেহ তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের দেওয়া হয়নি। (শ্মশানে দাহ করে পুলিশ, সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে। কয়েক বছর আগে চা( মজুমদারের পুত্র এই ইচ্ছাকৃত হত্যার তদন্ত চেয়ে কলকাতা হাইকোর্ট-এ একটি মামলা দায়ের করেন। পূর্বতন সরকার একটি তুচ্ছ পদ্ধতিগত প্র(্ন তুলে সেই মামলা খারিজ করে দেয়। ইচ্ছাকৃত খুনের এই ঘটনার তদন্ত প্রয়োজন।

১৯৬৯-১৯৭৭ সময়কালে কেবলমাত্র যুবক-যুবতী হওয়ার 'অপরাধে' পশ্চিমবঙ্গে অনেকের রক্ত( ঝরেছে। এর মধ্য থেকে আমরা মাত্র কয়েকটার উল্লেখ করবো, যেগুলো কোনও না কোনওভাবে পুলিশি বা কংগ্রেসি অত্যাচারের ফলে ঘটেছে বলে স্বীকৃতি মিলেছে। ১৯৭০ সালের ১১ আগস্ট তালতলায় ২০ বছরের ত(ণ কাজল ব্যানার্জীকে পুলিশ তার রিভলবার থেকে 'পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক' দূরত্ব থেকে গুলি করে হত্যা করে। কাজল পুলিশের রিভালবার ছিনতাই করছিলো বলে অভিযোগ করা হলেও সেই অভিযোগে টেঁকেনি। ১৮ আগস্ট শ্যামপুকুর থানার ওসি স্বয়ং অত্যাচার ক'রে সমীর ভট্টাচার্যকে হত্যা করে। স্থানীয় গণবি(োভ সামাল দিতে তৎকালীন পুলিশ কমিশনার রঞ্জিত গুপ্ত তদন্ত করে শ্যামপুকুর থানার ওসি-কে দোষী ঘোষণা করেন। বর্তমান সরকার আশা করি এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন।

১৯৭০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর কৃষ(নগর থানার পুলিশ বুড়ো হালদারকে পরওয়ানা ছাড়া থানায় নিয়ে গিয়ে অত্যাচার

করে মেরে ফেলে। স্থানীয় বি(োভের ফলে জেলাশাসক তদন্ত করে বলেন যে অত্যাচারের অভিযোগ সত্যি। পরে একটি তদন্ত কমিশন বসে, কিন্তু সেই কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট আজও প্রকাশিত হয়নি। আমরা এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করার দাবি জানাচ্ছি।

২৮ শে অক্টোবর ১৯৭০, পুলিশ বীরেন্দ্র দেবনাথকে একটি পূজোর প্যান্ডেলে পুলিশ-রাইফেল থেকে গুলি করে হত্যা করে রটিয়ে দেয় যে বীরেন্দ্র ফেরারি আসামী। পুলিশ কমিশনার তদন্ত করে বলেন যে পুলিশের অভিযোগ মিথ্যা, পুলিশ স্রেফ সন্দেহের বশে বীরেনকে হত্যা করেছে। পুলিশের দ্বারা সংগঠিত হত্যার কি কোনও বিচার হবে না?

১৯৭০ সালের ২০ নভেম্বর ঘটে বেলেঘাটার সেই ভয়াবহ ঘটনা। পুলিশ এবং নব কংগ্রেসি গুন্ডাদের যৌথ অভিযানে সিআইটি বিল্ডিং-এর ৫৫৬টি ফ্ল্যাটের প্রতিটিতে ঢুকে এই 'যৌথবাহিনী' তাণ্ডব চালায় এবং কোনও পরওয়ানা ছাড়াই ১০০ জন যুবককে গ্রেপ্তার করে। এদের মধ্যে চারজনকে বেলেঘাটা বালিয়াড়ির একটি পাঁচিলের সামনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে পুলিশ। সাংসদদের একটি প্রতিনিধিদল তদন্ত করে এই ঘটনা সত্য বলে বিবৃতি দেন।

১৯৭১ সালের ৬ নভেম্বর বেলেঘাটায় পুলিশ শিপ্রা সাহাকে অত্যাচার করে খুন করে। অসীমা পোদ্দারকে ধর্ষণ করা হয় ঐ একই দিনে। ২৮ শে নভেম্বর পানিহাটিতে কংগ্রেসি গুন্ডারা পুলিশের সহায়তায় কল্যাণী ব্যানার্জীর ওপর অত্যাচার করে। ঐ বছর আগস্ট মাসে আসানসোলে শ্রীমতী শিপ্রা রায়কে পুলিশ এমন অত্যাচার করে যে তিনি উন্মাদ হয়ে যান। ১৯৭৩ সালের ২৪ মার্চ পদ্মরাণী র(তকে পুলিশ অত্যাচার করে— পুলিশের ডিজি নিজে তাঁর অধীনে কর্মরত সহকর্মীদের অত্যাচারের নানান পদ্ধতি 'হাতে কলমে' দেখান!

অর্চনা গুহ-র মামলাটি নানা কারণে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এই মামলাটি পুলিশের বি(দ্ধে একমাত্র মামলা যেখানে অত্যাচারী পুলিশ অফিসার (ণু গুহনিয়োগী ও অন্যান্যদের নিম্ন আদালত শাস্তি দেয়। যতদিন এই মামলা চলেছে (মামলা আজও চলছে) ততদিন পূর্বতন সরকার (ণু গুহনিয়োগীকে সাসপেন্ড করেনি— তার পদোন্নতি ঘটেছে এবং অর্চনা গুহ-র পরিবারকে এই পুলিশ অফিসারটি হুমকি দিয়ে গেছে। এই মামলায় তারা জাল নথি দিয়েছে, পদে পদে পুলিশ-আইন ভেঙ্গেছে, কিন্তু (ণু প্রতিবারই প্রশাসনের মদতে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে আমরা চাই এই মামলাটির দ্রুত নিষ্পাত্তির জন্য উদ্যোগ গৃহীত হোক এবং যে সমস্ত অত্যাচারী পুলিশরা আজও জীবিত এবং এই মামলায় নিম্ন আদালতে নিম্ন আদালতে সাজাপ্রাপ্ত, তাদের বি(দ্ধে যথাযত ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

১৯৭৪ সালের বিশে জুলাই, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দিবসে কার্জন পার্কে নাটক দেখতে এসে নিহত হন প্রবীর দত্ত। তৎকালীন পুলিশ-মন্ত্রী এবং বর্তমান তৃণমূল বিধায়ক সুব্রত মুখোপাধ্যায় বিবৃতি দেন "নাটকের মাধ্যমে নকশালরা সংঘটিত হওয়ার চেষ্টা করায় পুলিশ একজন ফেরারি নকশালকে ধরতে গেলে সংঘর্ষ হয়।" প্রাক্ত(ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী বিবৃতি দেন, যুবকংগ্রেস বিরোধীদের "হাতের কব্জি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে"।

১৯৭৫ সালের মে দিবসের দিন হাওড়া জেলে ভয়াবহ বন্দীহত্যার ঘটনা ঘটে। আহতের সংখ্যা বিপুল। নিহতের সংখ্যা এখনও অনিশ্চিত। শর্মা কমিশন বসে— কমিশন জেলার সহ অনেক পুলিশকে দোষী বলে ঘোষণা করে। তৎকালীন পুলিশমন্ত্রী (আজকের তৃণমূল বিধায়ক) বলেন যে পুলিশ দায়ী নয়— জেলের মধ্যে 'জনরোষ'-এর ফলে এই ঘটনা ঘটেছে। আমরা চাই এই রিপোর্টটি প্রকাশ করা হোক।

ঝাড়গ্রামের পুলিশ ছাত্র শুভঙ্কর ষড়ঙ্গীকে পুলিশ লকআপে পিটিয়ে মেরে ফেলে। শুভঙ্করের বাবা অ(িনী ষড়ঙ্গী ১৯৮৮ সালে ঝাড়গ্রাম থানায় পুলিশের বি(দ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

এরকম অনেক ঘটনা আছে। ন্যায়বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে তদন্ত কমিশন গঠন করলে এমন নিয়মিত, ধারাবাহিক এবং সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডগুলির বিচার চাওয়া স্বাভাবিক এবং ন্যায়সঙ্গত। আমাদের আশা, দল এবং দলতন্ত্রের উর্ধে উঠে বর্তমান সরকার দৃঢ়তার সঙ্গে সকল অন্যায় অবিচার-এর বি(দ্ধে বিচারের বাণীকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করবে।

আগের সরকার অনেকগুলি তদন্ত কমিশন বসিয়েছিলো কিন্তু সেই সব তদন্ত কমিশন হয় মাঝপথে বন্ধ করে দিয়েছে নয় কমিশনকে ঠিকমতো কাজ করতে দেয়নি। অনেক (ে(ত্রেই কমিশনের রিপোর্ট পুলিশ-এর বি(দ্ধে যাওয়ায় পূর্ববর্তী সরকার সেই রিপোর্ট চেপে দিয়েছে। বিধানসভায় রিপোর্ট পেশ করেনি, বা বিধানসভায় পেশ করতে বাধ্য হলেও সেই রিপোর্ট-এর ওপর আলোচনা চলতে দেয়নি। ফলত তাদের যে ১১০০ কর্মী মারা গিয়েছিলেন তাঁদের হত্যাকান্ডের তদন্তও এইভাবে হিমঘরে পাঠানো হয়েছে। হরতোষ চত্র(বর্তী কমিশন বা তারাপদ মুখার্জি কমিশনে পুলিশি অত্যাচারের বি(দ্ধে অনেক দলিল জমা পড়ে। অনেক প্রত্য(দর্শী এই দুই কমিশনকে সা(ী দিতে সম্মত হয়ে চিঠি দেন। কিন্তু দু'জন পুলিশ অফিসার এই কমিশন গঠনের কিছু পদ্ধতিগত ত্রুটি দেখিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করে। পূর্বতন সরকার সেই নিষেধাজ্ঞা সরানোর কোনো উদ্যোগ না নেওয়ায় কার্যত কমিশনগুলি কাজ করে নি।

আগের সরকারের আমলের কয়েকটি পরিচিত তদন্ত কমিশনের কথা বলে শু( করা যেতে পারে। ১৯৮০-র দশকের প্রথম দিকে কিছু ন্যায্য দাবি নিয়ে জুনিয়র ডাক্ত(াররা বেশ কয়েক

বছর ধরে আন্দোলন করছিলেন। এই আন্দোলনের ওপর দফায় দফায় পুলিশ অত্যাচার চালায়, যথেচ্ছ লাঠি চালায়। একজন মহিলা জুনিয়র ডাক্ত(ারের পা-এর হাড় ভেঙে যায়। ১৯৮৭ সালে পিজি হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্ত(ারদের ওপর কলকাতা পুলিশের তৎকালীন ডিজি সুলতান সিং বেপরোয়া লাঠি চালায়ে রোগী ও রোগীর পরিবারবর্গ সহ ডাক্ত(ারদের পেটান। তিনি বর্তমানে শাসকদলের বিধায়ক। এই ঘটনার তদন্তের জন্য বিচারপতি এ কে ভট্টাচার্য কমিশন বসেছিলো, কিন্তু পূর্বতন সরকার সেই রিপোর্ট প্রকাশ করেনি। এই সুলতান সিং-এর নেতৃত্বেই ১৯৯৪ সালে কংগ্রেসের ডাকা বাংলা বন্ধের দিন শিয়ালদায় নির্বিচারে গুলি চলে। এই ঘটনার জন্য বিচারপতি কল্যাণময় গাঙ্গুলী কমিশন গঠিত হয়, কিন্তু কমিশনের কাজ যখন একেবারে শেষ পর্যায়ে, তখন পূর্বতন সরকার এই কমিশন গুটিয়ে নেয় এবং আইনের সুস্পষ্ট নির্দেশ লঙঘন করে সুলতান সিং-এর নিয়মিত পদোন্নতি হয়।

১৯৯২ সালে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার দাবিতে শান্তিপূর্ণ আইন অমান্য করার সময় পুলিশ গুলি চালিয়ে ৭ জনকে হত্যা করে। পূর্বতন সরকার হরিহর দাস কমিশন গঠন করে। এই ঘটনার এত প্রত্য( দর্শী ছিলো যে সরকার ভীত হয়ে পড়ে, পদ্ধতিগত প্র(ে তুলে কমিশন গুটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালায়। কিন্তু হাইকোর্টের নির্দেশে কমিশনের কাজ চালু থাকে। সরকার ২০০১ সালে বিধানসভায় কমিশনের রিপোর্টটি পেশ করতে বাধ্য হয়, কিন্তু হইচই বাধিয়ে এবং স্পিকারের হস্ত(েপে সেই রিপোর্টের ওপর আলোচনার সুযোগ দেয়নি। কমিশন সুস্পষ্টভাবে পুলিশদের দায়ী ক'রে মৃত ব্যক্তি( পিছু ৫ ল( টাকা (তিপূরণের সুপারিশ করে, কিন্তু সরকার মর্জিমাফিক মৃত ব্যক্তি( পিছু মাত্র ২৫ হাজার টাকা করে (তিপূরণ দিয়েছে! নতুন সরকারের কাছে আমাদের দাবি, ১৯৪৭ থেকে আজ পর্যন্ত যতগুলি কমিশন হয়েছে, তাদের রিপোর্ট জনসম( প্রকাশ করা হোক এবং কমিশনগুলোর সুপারিশগুলো যেখানে যতটা সম্ভব কার্যকর করা হোক। অন্তত যে সমস্ত পুলিশ, সরকারি আমলা, দুনীর্তিগ্রস্থ রাজনৈতিক ব্যক্তি(রা এই সমস্ত কুকীর্তির পান্ডা তাদের জনসম( চিহ্নি(ত করা হোক, তাদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা, পদক, উপাধি কেড়ে নেওয়া হোক! অনেক পুলিশ অফিসারও সমাজ-বিরোধীদের হাতে নিহত হয়েছেন। ১৯৮৪ সালে ২৮শে মার্চ, পোর্ট-এর পুলিশ বিনোদ মেহতা-কে খুনের অভিযোগে ধৃত ইদ্রিস মিএ(া পুলিশ হেপাজতে মারা যান। এই ঘটনার তদন্তের জন্য জাস্টিস এস সি দেব কমিশন গঠিত হয়। কমিশন মন্তব্য করে ''ইদ্রিসকে নৃশংসভাবে পেটানো হয়, যার ফলে তার মৃত্যু ঘটে— জিজ্ঞাসবাদের সময় এমন প্রহার অস্বাভাবিক এবং হত্যার সমতুল্য। কিছু পুলিশ অফিসার চোরাপাচারকারী এবং অসৎ ব্যবসায়ীদের আড়াল করার জন্য এই কাণ্ড ঘটিয়েছে...।'' (*টেলিগ্রাফ*, ১৯/৯/৮৯)

কংগ্রেসি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে যে সমস্ত কংগ্রেসিরা নিহত হয়েছেন তাঁদেরও ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। কংগ্রেসি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে প্রকাশ্যে খুন হন কংগ্রেস বিধায়ক চন্ডী মিত্র, যা নিয়ে কোনও তদন্ত কমিশন বসেনি। ১৯৭১-এ নব কংগ্রেস নেতা নেপাল রায় বিধায়ক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করার পর প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হন। এই খুন নিয়ে জলঘোলা হলে, তৎকালীন সাংসদ এবং পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত দপ্তরহীন মন্ত্রী প্রয়াত সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মন্তব্য করেন যে নকশালপন্থীরা এই হত্যার জন্য দায়ী। কিন্তু তদন্ত অগ্রসর হলে কংগ্রেসি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের রিপোর্ট সামনে আসতে শু( করে এবং ১৯৭২ সালের পর এ বিষয়ে আর কোনও পদ(েপই নেওয়া হয়নি। এই বিষয়েও তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

১৯৭১-এ নবকংগ্রেসি-যুবকংগ্রেসিদের একটি প্রিয় স্লোগান ছিলো, 'সবার প্রিয় শতদা যুগ যুগ জীও।' শত ঘোষ ওরফে প্রফুল্লকান্তি ঘোষের বি(দ্ধে কংগ্রেসিদেরই বি(দ্ধ গোষ্ঠী গুন্ডাবাজি, হত্যা, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদির বহু অভিযোগ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের কাছে জমা দেয়। কিন্তু তখন ওয়াংচু কমিশনে অনেক কংগ্রেস মন্ত্রীর আর্থিক কেলেঙ্কারির কথা প্রকাশ্যে নিয়ে আসায় এই সমস্ত অভিযোগ ধামাচাপা পড়ে যায়। বেলঘরিয়ার নামকরা 'নাগরিক' ইনু মিত্র-র অত্যাচারের কথাও এ প্রসঙ্গে মনে করা দরকার, যেমন মনে করা দরকার বর্তমান বিধায়ক শ্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের 'দেহর(ী' কসবার ত্রাস দেবা ওরফে দেবাশিস দত্ত-র অত্যাচারের কথা। পূর্বতন সরকারের আমলে এমন গুন্ডামি, অত্যাচারের জন্য কিছুই করা হয়নি একথা সত্যি এবং তা সর্বতোভাবে নিন্দনীয় এক কুকীর্তি। কিন্তু আমাদের উল্লেখ করা ঘটনাগুলো এবং আরও অনেক ঘটনা যা আমরা স্থানাভাবে উল্লেখ করিনি, সেগুলোর জন্য কোনো নীতি-নির্দেশ, কোনো দিশা, কোনও বাস্তবসম্মত মানবিক পদ(েপ দৃশ্যমান না হলে বর্তমানের তদন্ত কমিশন গঠনের মতো সদর্থক কাজও জনসম( প্রহসন এবং অপরাধীদের আড়াল করার ছক হিসেবেই প্রতিভাত হবে!

এছাড়াও ছাত্র পরিষদের (মহাজাতিসদন-পন্থী এবং শি(া-বাঁচাও-কমিটি-পন্থী) গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে যে নিয়মিত, ধারাবাহিক নৃশংস গুন্ডাবাজি চলেছিল, তারও তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। দেখা যাক 'দলতন্ত্র' নিকেশ করার জন্য 'প্রতিজ্ঞাবদ্ধ' দল তাঁদের পুরনো দলীয় সন্ত্রাস নিয়ে কতটা তদন্ত করেন। যাঁরা মৃত, তাঁরা আজকের এই 'সুপ্রভাত'-এ ফিরবেন না, কিন্তু গণতান্ত্রিক মানুষের দাবি, এইসব আত্মবলিদানের মর্যাদা র(া করা হোক, দোষীরা শাস্তি পাক।

প্রবন্ধ

# পরমাণু শক্তি( বর্জন করলে মানবসমাজ সংকটে পড়বে— এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত

সুজয় বসু

পরমাণু শক্তি(র প( যে যুক্তি(গুলি দেখানো হয় তার মধ্যে প্রধান হলো, সীমিত ভাণ্ডারের জীবা৻্ম-জ্বালানির অর্থাৎ তেল-গ্যাস-কয়লার বহুল ব্যবহারে দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসা। শিল্পযুগের সূচনা ও মানব-সভ্যতার চমকপ্রদ উন্নয়ন সম্ভব হয়েছিল এই জ্বালানিগুলিকেই আশ্রয় করে। সুতরাং এই জ্বালানি সরবরাহে ঘাটতি হলেই জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হবে। এ( ত্রে যেহেতু পরমাণু শক্তি(র উৎপাদনে জ্বালানির প্রয়োজন খুবই কম— এক কিলোগ্রাম ইউরেনিয়াম ত্রিশ ল( টন কয়লার সমান শক্তি( দিতে পারে— তখন তেল-কয়লার অভাব সহজে, অতি সহজেই মেটানো যাবে পরমাণু চুল্লিতে ইউরেনিয়াম জ্বালানির সাহায্যে প্রচুর পরিমাণ শক্তি( উৎপাদন করে। ইউরেনিয়াম খনিজ আকর থেকে পাওয়া যায় এবং তারও ভাণ্ডার সীমিত— এই প্র৻েরও সহজ সমাধান রয়েছে পরমাণু চুল্লির পোড়া জ্বালানি পুনঃপ্রকরণের মাধ্যমে নবীকরণ করে। তাছাড়া এমন চুল্লিও তৈরি হয়েছে যাতে এক গাড়ি জ্বালানি পুড়িয়ে দু গাড়ি জ্বালানি পাওয়া যাবে। অর্থাৎ জ্বালানির অভাব প্রযুক্তি(র উন্নয়ন করেই স্থায়ীভাবে মেটানো সম্ভব। আর একটা কারণেও কয়লা-তেল-গ্যাসের ব্যবহার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কমিয়ে আনতে হবে। এই জ্বালানিগুলির দহনে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরি হয়। গত দেড়শো বৎসরেরও বেশি সময় ধরে এই জ্বালানিগুলি অধিক ও আরও অধিক মাত্রায় জ্বালানোর কারণে বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণ এই গ্যাস জমা হয়েছে। বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের স্থায়িত্ব পঞ্চাশ থেকে দুশো বৎসরের মত। গ্যাসটির পরিমাণ বৃদ্ধিই বি৻ে উষ(ায়ণের প্রধান কারণ হিসাবে বিজ্ঞানীরা চিহ্(ত করেছেন। বর্তমানে মানবসমাজের সামনে এই উষ(ায়ণের সমস্যাটিই সবচেয়ে গু(তর বলে মনে করা হচ্ছে। এর সমাধানে প্রথম পদ( প হল জীবা৻্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানো। অর্থাৎ জ্বালানির কোন অভাব নাও যদি হয় তাহলেও তার ব্যবহারে রাশ টানা। শক্তি( সরবরাহের ( ত্রে জীবা৻্ম জ্বালানির ব্যবহার প্রসঙ্গে এই দুটি সীমাবদ্ধতার কথাই পরমাণু-প্রেমীরা সোচ্চারে ঘোষণা করে থাকেন।

শক্তি(র উৎস নির্বাচনের ( ত্রে দু-তিনটি বিষয় ভালভাবে বিচার করা প্রয়োজন। প্রথমত তার ছেদহীন সরবরাহ, দ্বিতীয়ত তার অর্থনীতি এবং তৃতীয়ত তার পরিবেশ নিরপে( তা। আরও কয়েকটি দিক রয়েছে কিন্তু এই তিনটিই প্রধান। উৎসটি বহুকাল ধরেই বহাল থাকবে, নিঃশেষিত হবে না এবং ত্র(মবর্ধমান চাহিদা মিটিয়ে যেতে পারবে। সুলভ হবে, যাতে সকলের ত্র(য় ( মতার ভিতরে থাকে— ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে পারেন। এই উৎসের ব্যবহারে পরিবেশের বড় রকমের এবং দীর্ঘমেয়াদী কোন ( তি হবে না। উৎসমাত্রেই যে এই শর্তগুলি সর্বাংশে পূরণ করবে তা নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু প্রয়োগ( ত্রে বিশিষ্টতার কারণে কোন বিচ্যুতি হলে তা মানা যাবে (যেমন, উপগ্রহে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য মহার্ঘ্য সৌরকোষের প্রয়োগ)।

পরমাণু শক্তি( এই শর্তগুলি কতটা পূরণ করে সেটা বিচারের আগে দেখে নেওয়া যাক বি৻ের উষ(ায়ণ রোধে জীবা৻্ম-জ্বালানির পরিবর্তে এর গ্রহণযোগ্যতা। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি আন্তর্জাতিক স্তরে প্রথম আলোচনায় আসে ১৯৮৭ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে। বি৻ে আবহাওয়া সংস্থা (ওয়ার্ল্ড মিটিওরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন) ও রাষ্ট্রসংঘ পরিবেশ প্রকল্প (ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম) যৌথভাবে এই অধিবেশনে জলবায়ু পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদী (য়( তির বিষয়গুলি সদস্যদেশগুলির প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরেন। বিষয়টির অপরিসীম গু(ত্ব মেনে নিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ১৯৮৮ সালেই গঠন করে 'আন্তঃরাষ্ট্রীয় জলবায়ু পরিবর্তন বিশারদ সমিতি' (ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ— IPCC)। এই সমিতির সদস্যের তালিকায় রয়েছেন চার হাজারেরও বেশি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞরা। সমিতি এ পর্যন্ত চারটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ২০০১ সালের তৃতীয় প্রতিবেদনে বি৻ে উষ(ায়ণের প্রতিকারে জীবা৻্ম-জ্বালানির পরিবর্তে পরমাণু শক্তি(কে বিশেষজ্ঞরা শুধু যে সুপারিশ করেন নি তাই নয়, এই অভিমতের সমর্থনে পাঁচটি সুস্পষ্ট কারণও উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল ঃ (ক) গ্যাস টারবাইন যৌথচত্রে(র তুলনায় অধিক মূল্য( (খ) কেন্দ্র চলাকালীন নিরাপত্তা ও বর্জ্য সম্পর্কে জনসাধারণের প্রতিকূল মনোভাব( (গ) তেজ৺(য় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরমাণু জ্বালানীর পুনঃপ্রকরণ সংত্র(ান্ত নিরাপত্তা( (গ) তেজ৺(য় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরমাণু জ্বালানির পুনঃপ্রকরণ সংত্র(ান্ত নিরাপত্তা( (ঘ) পরমাণু জ্বালানির পরিবহনের ঝুঁকি ও (ঙ) পরমাণু অস্ত্রের প্রসার। চতুর্থ প্রতিবেদনে, একটি বিশেষ গোষ্ঠীর প্রভাবে, শক্তি(( ত্রে সৌর ও নবীকরণযোগ্য শক্তি(র সঙ্গে পরমাণু শক্তি(র উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু নিরাপত্তা, পরমাণু অস্ত্র-সম্প্রসারণ ও বর্জ্য যে অন্তরায়— এই মন্তব্যও করা হয়েছে।

বি৻ের বিশিষ্ট পরিবেশ-বিশেষজ্ঞরা পরমাণু শক্তি(র গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি জাপানের ফুকুশিমা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরাট এবং মারাত্মক

দুর্ঘটনার পর প্রথম বিশ্বের দেশগুলিতে জনমতের চাপে পরমাণু শক্তির প্রসার বন্ধ হয়েছে। জার্মানি, সুইডেন, হল্যান্ড, ইতালি ও স্পেন এই পাঁচটি দেশ পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দেবার নির্দিষ্ট কর্মসূচি নিয়েছে। শিল্পোন্নত দেশে যদি পরমাণু শক্তির ব্যবহার বন্ধ হয় তাহলে শক্তির যোগানের ব্যবস্থা করতেই হবে এবং করাও যাবে। সম্প্রতি আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিশারদ সমিতি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে সৌরশক্তি বিভিন্নরূপে পৃথিবীর ৮০ শতাংশ শক্তির চাহিদা মেটাতে পারবে এবং এটা সম্ভব হবে ২০৫০ সালের মধ্যেই।

পরমাণু শক্তির কোন গ্রহণযোগ্যতাই স্থিতিবুদ্ধির বিচারে নেই। মহার্ঘ্য ও অতি বিপজ্জনক এই উৎসটি মানবকুল যত শীঘ্র বর্জন করেন ততই এই গ্রহের মঙ্গল। একটি সঙ্গত প্রশ্ন উঠতেই পারে। তা হলো পৃথিবীর এই ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর শক্তির চাহিদা, যা বেড়েই চলেছে ছেদহীন ভাবে, তার যোগান আসবে কোথা থেকে। সঙ্গত প্রশ্ন। কয়লার প্রচলন হয় ষোড়শ শতকে খনিজ তেল উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে। শিল্পযুগের সূচনা এই সময় থেকেই মোটামুটি ধরা হয়। শক্তির লাগামছাড়া ব্যবহারবৃদ্ধি ঘটেছে বিংশ শতকে। এই শতাব্দীর সূচনায় পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ১৬০ কোটি এবং বাৎসরিক বাণিজ্যিক শক্তি ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ১০০ কোটি টন তেল-সম (সম পরিমাণ খনিজ তেলের সম্পূর্ণ দহনে যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়)। শতাব্দী শেষে জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৬০০ কোটি এবং শক্তি ব্যবহার ১০০০ কোটি টন তেল-সম— অর্থাৎ চারগুণের কম জনসংখ্যা বাড়লো আর শক্তির ব্যবহার বাড়লো দশগুণ। ধরিত্রী এই চাপ সহ্য করার অবস্থায় নেই। খনিজ তেল ফুরিয়ে আসছে। বিপুল পরিমাণ তেল-কয়লার দহনে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড-এর পরিমাণ লক্ষ ৩৯ ভাগ পৌঁছেছে— গত সাড়ে ছ লক্ষ বৎসরে এই গ্যাসের পরিমাণ লক্ষ ৩০ ভাগ অতিক্রম করে নি। মানুষ এই পৃথিবীর জলবায়ু এমন পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে যাতে জীবকুলের জীবনরক্ষাতেই এক গভীর সংকট দেখা দিচ্ছে। সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজনে এখনই শক্তির যথেচ্ছ ব্যবহার ও অপচয় বন্ধ করার প্রয়োজন, আন্তর্জাতিক স্তরে এই আলোচনা গত দু দশক ধরেই চলছে। সামান্য সচেতনতা এসেছে কিন্তু শক্তি ব্যবহারের যে ধারা চলে আসছে তার কোন পরিবর্তন লক্ষিত হচ্ছে না। সরকারি তরফে নিয়মরক্ষায় কিছু নির্দেশ, কিছু কর্মসূচি ঘোষিত হয়েছে কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটছে না।

শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেমন কার্বনহীন উৎসকে গুরুত্ব দিয়ে তার ব্যাপক প্রসার প্রয়োজন, তেমনই শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও সংযমের সঙ্গে প্রয়োজন শক্তি সংরক্ষণের। শক্তি উৎপাদন করা হয় বিভিন্ন রূপে, প্রধান হল তাপশক্তি ও বিদ্যুৎশক্তি। যান্ত্রিক শক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থানীয় উৎপাদনই প্রাধান্য পায়, কারণ শক্তিকে এই রূপে স্থানান্তরে প্রেরণ প্রায় অসম্ভব। একমাত্র বিদ্যুৎ শক্তিকেই বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে দূরদূরান্তে পরিচলন সম্ভব। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নাগরিক জীবনযাত্রায় ও কলকারখানায় বিদ্যুতের ব্যাপক ব্যবহার থাকলেও বিদ্যুৎশক্তি প্রায় সব দেশেই মোট ব্যবহৃত শক্তির এক-তৃতীয়াংশের মত হয়। পরমাণু শক্তি একমাত্র বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তর করেই ব্যবহার করা হচ্ছে— জাতীয় বিদ্যুৎ সরবরাহী তন্ত্রের সঙ্গে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে সংযুক্ত করেই এই শক্তির ব্যবহার হয়। সেদিক থেকে উৎস হিসাবে পরমাণুর একটা সীমাবদ্ধতাও রয়েছে।

পরমাণু শক্তিকে সম্পূর্ণ বর্জন করার প্রস্তাবে দেখে নেওয়া দরকার পৃথিবীর প্রায় ৭০০ কোটি মানুষের শক্তির প্রয়োজন কিভাবে মেটে। 'ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি'-র সাম্প্রতিক-তম পরিসংখ্যান (২০০৮ সালের) অনুযায়ী এই বৎসরে শক্তির ব্যবহার হয়েছে ১,২২৭ কোটি তেল-সম এবং তা সংগ্রহ হয়েছে শতকরা হিসাবে ঃ তেল-৩৩.২%, কয়লা - ২৭.০%, প্রাকৃতিক গ্যাস-২১.১%, জলশক্তি-২.২%,জৈবভর-১০.০%, পরমাণু শক্তি-৫.৮%, ও অন্যান্য (নবীকরণযোগ্য)-০.৭%। পরমাণু শক্তি (একমাত্র বিদ্যুৎরূপেই) দিয়েছে পৃথিবীর মোট উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তির ১৪ শতাংশের কম। ২০১০-এ এই অংশটা আরও কম হবে। এই বৎসরে বিশ্বে বায়ু-বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন মোট বিদ্যুতের ২.৫%, উৎপাদন ক্ষমতা ২ লক্ষ মেগাওয়াট। ২০২০ সালে এটা বেড়ে দাঁড়াবে ১৫ লক্ষ মেগাওয়াট। আগামী দশ বৎসরে বিদ্যুৎ ব্যবহার মাত্রা বাড়বে। যে হারে বাড়বে সেই হারে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়বে না, ফলে তার অংশটা ১৪ শতাংশের কমই থাকবে। সুতরাং দায়িত্ব নিয়ে এটা নিশ্চয়ই বলা যায় যে বায়ু-বিদ্যুৎ উৎপাদনমাত্রা বাড়িয়েই পরমাণু বিদ্যুতের অভাব কিছুটা মেটানো যাবে। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক দল আমেরিকার 'ন্যাশনাল এরোনটিকস্ অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' বা নাসা-র সহযোগিতায় কৃত্রিম উপগ্রহ ও বেলুনের সাহায্যে সারা পৃথিবীর বায়ুপ্রবাহের গতি এবং স্থায়িত্ব সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করে এবং তা বিশ্লেষণ করে সাড়ে সাত হাজার বায়ু-বিদ্যুৎ উৎপাদনযোগ্য স্থানের সন্ধান পেয়েছেন। এঁদের মতে, এই স্থানগুলির (যেমন টাসমানিয়া দ্বীপ) মাত্র ২০ শতাংশে বায়ুখামার ('উইণ্ডফার্ম') বসিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষের বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো যাবে।

সৌরকোষের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দক্ষতা, সরকারি অবহেলা সত্ত্বেও, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির গবেষণার ফলে ধীরে ধীরে বাড়ছে, বাণিজ্যিক স্তরেই এই কোষগুলির দক্ষতা ১৭ শতাংশে পৌঁছেছে। সঙ্গে সঙ্গে দামও কমছে। বর্তমানে সৌরকোষ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৫০০০ মেগাওয়াট ছাড়িয়ে গেছে। আমেরিকার 'ন্যাশনাল রিনিউয়েবল এনার্জি

ল্যাবরেটরি-র তিন গবেষক সৌরশক্তি থেকেই ২০৫০ সালে আমেরিকার বিদ্যুৎ চাহিদার ৯০ শতাংশ মেটানোর পরিকল্পনার নকশা প্রকাশ করেছেন। একথা ঠিক যে সৌরশক্তি সবসময় সমানভাবে পাওয়া যায় না। এর হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। সর্বক্ষণের চাহিদাপূরণ তাৎক্ষণিক উৎপাদনে সম্ভব নয়। প্রয়োজন শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থার, সাধারণভাবে ব্যাটারির সাহায্যে যা অহরহই করা হয়ে থাকে। খুব বড় মাপে সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে ব্যাটারির দুর্বলতা রয়েছে। বড় মাপের বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চয়ের দুটি পৃথক পদ্ধতি অনেকদিন ধরেই ইউরোপ ও আমেরিকায় চলছে। প্রথমটি হল বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত থাকার কালে নীচের জলাধার থেকে বিদ্যুতের সাহায্যে পাম্প করে জল উপরের জলাধারে তোলা এবং প্রয়োজনে উপরের জলাধার থেকে জল ছেড়ে, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতই বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ঘাটতি মেটানো। দ্বিতীয়টি জলের পরিবর্তে বাতাসকে খুব উঁচু চাপে বদ্ধ আধারে, মাটির নীচে কোন গহ্বরে বা মাটির উপরে কোন ধাতব আধারে রেখে দেওয়া বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত অবস্থায়। কমপ্রেসর চালিয়ে আবার ঘাটতির সময় উঁচু চাপের বাতাসের সাহায্যে টারবাইন জেনারেটর চালিয়ে ঘাটতি মেটানো। পদ্ধতি দুটিই প্রাচীন এবং পরীক্ষিত, কোন নতুন উদ্ভাবন প্রয়োজন নেই। এই জাতীয় যন্ত্রপাতি এখনই বাজারে বিক্রি হয়। স্বল্প সঞ্চয় ব্যাটারির সাহায্যেই করা যাবে। নতুন উন্নত ধরনের ব্যাটারি পাওয়া যাচ্ছে— ওজন কম, সঞ্চয় ক্ষমতাও বেশি। সুতরাং পরমাণু বিদ্যুৎ বর্জন করলে এই আধুনিক সভ্যতা রসাতলে যাবে ধারণাটা সম্পূর্ণ অমূলক। বস্তুত তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে আশংকা বাড়ছে সরবরাহ নিয়ে। উৎপাদন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছতে খুব একটা দেরি নেই। তার পর থেকেই সরবরাহে স্থায়ী টান ধরবে। এ সম্পর্কে এখন থেকেই ব্যবস্থাদি নেওয়া দরকার জরুরি ভিত্তিতে।

একথা স্বীকার করতেই হবে অস্ত্রসম্পর্ক জোরালো থাকার কারণে তৃতীয় বিশ্বের কয়েকটি দেশে, বিশেষ করে ভারতে ও পাকিস্তানে, পরমাণু শক্তির খাতে ব্যয়বরাদ্দ অতি অসঙ্গতভাবে মাত্রাতিরিক্ত হয়েছে। ভারতে পরমাণু শক্তি কমিশন গঠিত হয়েছিল ১৯৪৮ সালে, দেশের স্বাধীনতা অর্জনের এক বৎসরের মধ্যেই। এশিয়ায় ভারতই ছিল অগ্রণী। সেই সময় থেকে এই বর্ধিত ব্যয়বরাদ্দে লালিত হয়েছে পরমাণু শক্তি বিভাগ। ষাট বছরের বেশি সময় পেরিয়ে এসে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরমাণু শক্তির অবদান মাত্র ৩ শতাংশ। নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন এ দেশে পরমাণুর প্রবল প্রতাপে অবহেলিতই থেকে গেছে। সরকারের একটি বিভাগ সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৮২ সালে প্রধানমন্ত্রীর অধীনে— 'অচিরাচরিত শক্তি বিভাগ' (ডিপার্টমেন্ট অব নন-কনভেন্‌শনাল এনার্জি সোর্সেস)। এই বিভাগের উদ্যোগে ১৯৮৬ সালে গুজরাতে একটি ছোট বায়ুবিদ্যুৎকেন্দ্র বসিয়ে এ দেশে বায়ুবিদ্যুৎ উন্নয়নের সূচনা হয়। মাত্র দশ বৎসরে, ১৯৯৬ সালে, বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদনে ভারত বিশ্বে তৃতীয় স্থানের অধিকারী হয়। এখনও অবধি এদেশ বায়ু শক্তির ক্ষেত্রে গৌরবজনক পঞ্চম স্থানে রয়েছে। আন্তর্জাতিক বায়ুশক্তি সংস্থা— 'ইন্টারন্যাশনাল উইণ্ড এনার্জি অ্যাসোসিয়েশন'-এর বর্তমান সভাপতি একজন ভারতীয়। নবীকরণযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে গত নব্বই-এর দশকে সরকারি ব্যয়বরাদ্দ ছিল শক্তি খাতে মোট ব্যয়বরাদ্দের ১.৬ শতাংশ মাত্র। পরমাণুর প্রবল প্রতাপে নবীকরণযোগ্য শক্তির উন্নয়ন এ দেশে পূর্বাপর অবহেলিত থেকেছে। শক্তি উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে ডেনমার্ক একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বায়ুবিদ্যুৎ প্রযুক্তিতে এই দেশ বিশ্বে সেরা, মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনে ২০১০ সালে বায়ু থেকে এসেছে ২৪ শতাংশ। প্রথম থেকেই ডেনমার্ক পরমাণু শক্তিকে বর্জন করে। অধিক গুরুত্ব দেয় শক্তির উৎপাদন ব্যবহার ব্যবস্থাপনায় অপচয় রোধে। ঐ দেশের জাতীয় আয় বেড়েছে শক্তি ব্যবহারের পরিমাণ না বাড়িয়েই। সরকার বিচক্ষণতার সঙ্গে একদিকে যেমন নবীকরণযোগ্য শক্তি, বিশেষ করে বায়ুশক্তির, প্রযুক্তি উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিয়েছে, অন্যদিকে অপচয়কে যথাসম্ভব, প্রয়োজনে আইন করে, কমিয়ে এনেছে।

ভারতে শক্তিনীতির কোন দীর্ঘকালীন রূপরেখা রচিত হয়নি। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে সরকারী কর্মসূচি ঘোষিত হয়েছে, অধিকাংশই প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেগুলি আন্তরিকতা এবং সততার সঙ্গে অনুসৃত হয় নি। দেশে বিদ্যুৎ ঘাটতির পরিমাণ সামান্য নয়, অপচয়ের পরিমাণও কম নয়, এক দশকেরও বেশি নানা টালবাহনার পর অপচয় রোধে একটি সরকারি আইন পাশ হয়েছে ২০০২ সালে। আইনভঙ্গ-কারীদের শাস্তির উল্লেখও আইনে আছে, থাকতেই হবে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে আইনটি বলবৎ করা যায় নি। পরমাণু বিদ্যুতে সরকারি আগ্রহ ও আকুলতার বিপরীতে শক্তি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সরকারি উদাসীনতাকে ক্ষমার অযোগ্য বলতে দ্বিধা হয় না।

বিপদজ্জনক ও মহার্ঘ্য পরমাণু শক্তির কোন প্রয়োজনই এদেশে নেই। নবীকরণযোগ্য শক্তির উন্নয়ন ও বিস্তার এবং সংরক্ষণের সঠিক ও সম্ভাব্য প্রয়োগের সুফল পেতে এক/দুই দশক লেগে যাবে। ততদিন কয়লাকে আশ্রয় করে শক্তির প্রয়োজন মেটানো যাবে— কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ খুব একটা না বাড়িয়েই। সমস্যার গুরুত্ব কেউই অস্বীকার করেন না। প্রয়োজন একটা সুস্থ সমাধানের।

এই সমাধান আসবে পরমাণু শক্তিকে সম্পূর্ণ বর্জন করেই।

প্রবন্ধ

# দলতন্ত্র থেকে জনশক্তি(— উত্তরণ কোন্ পথে?

শুভংকর চন্দ

r এক

নিপীড়িত ব্যাপক নারীপু(যের সার্বিক মুক্তি(র ল( ্যে পরিচালিত সংগ্রামের অনুশীলন নির্ভর করে তার তত্ত্ব ও পদ্ধতির সঠিকতার উপরে। এই ল( ্যে পৌঁছোবার প্রাথমিক পর্যায়ে বিজয় অর্জন সত্ত্বেও যে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসতে হতে পারে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের অভিজ্ঞতা সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে। জনগণের সাংস্কৃতিক ও শি(াগত চৈতন্যের পশ্চাৎপদতা এবং অন্যদিকে সমাজতন্ত্রেও শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি এই দুটি দেশে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনুশীলনের মৌলিক তত্ত্ব ও পদ্ধতি সম্পর্কিত চেতনা বৃদ্ধির পিছনে সাংস্কৃতিক চেতনার এই ভূমিকার গু(ত্ব লেনিন কিন্তু সার্বিকভাবেই বুঝেছিলেন। তিনি একথা উপলব্ধি করেছিলেন যে, আমলতন্ত্রকে হটিয়ে দিয়ে উৎপাদন সহ সমস্ত (েত্রে মেহনতি মানুষের প্রত্য( ও সরাসরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পথে অন্যতম বাধা হচ্ছে জনগণের সাংস্কৃতিক মানের ভয়ংকর পশ্চাৎপদতা। লেনিন তাই আহ্বান জানিয়েছিলেন সাংস্কৃতিক বিপ-বের। স্তালিনও সেই আহ্বানের পুনরাবৃত্তি করে বলেছিলেন, ''আমলাতন্ত্রের সবচেয়ে *নিশ্চিত প্রতিষেধক হচ্ছে শ্রমিক ও কৃষকদের সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়ন*''। রাষ্ট্রযন্ত্রের আমলাতান্ত্রিকতাকে অভিশাপ দেওয়া যায় বা নিন্দা করা যায়... কিন্তু যতদিন না ব্যাপক মেহনতি মানুষ সাংস্কৃতিক মানের একটি নির্দিষ্ট স্তরে উন্নীত হচ্ছে যা রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করার সম্ভাবনা, ইচ্ছে বা যোগ্যতার জন্ম দেবে, ততদিন রাষ্ট্রযন্ত্র ও আমলাতন্ত্র টিকে থাকবে, কাজেই শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতি কৃষকদের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন— শুধুমাত্র শি(ার উন্নয়ন নয়, যদিও সেটাই সমস্ত সংস্কৃতির ভিত্তি, বরং *প্রাথমিকভাবে দেশের শাসনকাজে অংশ নেবার যোগ্যতা অর্জন*— রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংগঠনের অগ্রগতির হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে।'' তিনিও উৎপাদন সংস্থাগুলিতে আমলাতন্ত্রের অবসান ঘটানোর একমাত্র পথ হিসেবে 'নীচু স্তর থেকে মেহনতি জনতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা' করার অবশ্য-প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছিলেন।'

ফলত যে সর্বহারা নারী-পু(যের মুক্তি(র জন্য রাশিয়ার বিপ-ব, রাজনৈতিক (মতা চর্চার অভিজ্ঞতা, অর্থনৈতিক বিবেচনা, শৈ(িক এবং নৈতিক চেতনার দিক থেকে (এক কথায় 'সাংস্কৃতিক' দিক থেকে) সেই সর্বরিক্ত(দের দল ১৯১৭ পরবর্তী সময়ে এতটাই পিছিয়ে ছিল যে উৎপাদন সহ সমস্ত (েত্রে সাধারণ জনতার প্রত্য( নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার হয়ে পড়ে এবং প্রচন্ড গতিবেগে আমলাতন্ত্র (আমলাসুলভ কর্তৃত্ববাদী আধিপত্যবাদী মানসিকতা) তার যাবতীয় দ(তা এবং উচ্চমন্য দাঁত নখ সহ ফিরে এসে পুনরায় মৌরসি পাট্টা গাড়ে। পরিণতিতে ল( ল( নারী পু(যের রক্তে( স্নান করে ওঠা মানুষের মতো বেঁচে থাকবার স্বপ্নটি দস্যু পায়ের কাঁটামারা জুতোর তলায় পুনরায় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

কিন্তু ১৯১৭-র মহা উত্থানের পরেও নিপীড়িত নারী-পু(য সাংস্কৃতিক চেতনাগত জায়গা থেকে এতটা পিছিয়ে ছিল কেন?

উত্তরটা পাই তার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে ১৯৬৭ সালে, সমাজতান্ত্রিক চীনের অভিজ্ঞতার প্রে(িতে সেই বিপ-বের নেতা মাও-এর কাছ থেকে ঃ ''অতীতে আমরা গ্রামাঞ্চলে, কারখানায়, সাংস্কৃতিক (েত্রে সংগ্রাম চালিয়েছিলাম এবং আমরা সমাজতান্ত্রিক শি(াআন্দোলনও চালিয়েছি। কিন্তু এসব কিছুই সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছিল কারণ আমরা একটা রূপ (ফর্ম) একটা পদ্ধতি (মেথড) খুঁজে পাইনি যা সর্বতোভাবে (ইন অ্যান অলরাউন্ড ওয়ে) এবং তলা থেকে ব্যাপক জনগণকে আমাদের অন্ধকার দিকগুলোকে প্রকাশ্যে উন্মোচন করার কাজে জাগিয়ে তুলতে পারে।'' (সিপিসি-র নবম কংগ্রেসের রিপোর্ট, ইংরাজি সংস্করণ, পৃ ২৫)।

ধরা পড়েছে যে এ যাবৎ কালের সাম্যবাদী-বিজ্ঞানের ধ্রুপদী সাহিত্যে সাংস্কৃতিক বিপ-বের প্রয়োজনীয়তা নানা সময়ে স্বীকৃত হলেও সর্বতোভাবে এবং তলা থেকে ব্যাপক জনতাকে জাগিয়ে তোলার কোনো 'ফর্ম' এবং 'মেথড'-এর রূপরেখা তখনো আবিষ্কার করা যায়নি।

মাও মনে করেছিলেন যে সেই ফর্ম এবং মেথড হল 'সাংস্কৃতিক বিপ-ব'। একথা অনস্বীকার্য যে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ-ব থেকে সাম্যবাদী সংগ্রামের ভাণ্ডারে অতুলনীয় সব সঞ্চয় ঘটেছে। তবে একই সাথে একথাও স্বীকার্য যে নানা বাড়াবাড়ি ঘটেছিল তখন, ঘোষিত ল( ্য থেকে বহু জায়গায় বিচ্যুতি ঘটেছিল। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ ও রাষ্ট্র(মতা দখলে বিশিষ্ট-ভূমিকা পালনকারী নেতৃত্বের একাংশকে ল( ্যবস্তু করেছিল সাংস্কৃতিক বিপ-ব। বিপ-বের কেন্দ্রীয় প্র(্ন হলো রাষ্ট্র(মতা দখল এবং সাংস্কৃতিক বিপ-বের কাছেও (মতাদখলের প্র(্নটাই ছিল কেন্দ্রীয় বিষয়। অনেক(েত্রে 'জনগণ নিজেরাই নিজেদের মুক্ত( করবে' এই পথে চলার কথা বলেও চলা যায়নি, উপদলীয় লড়াই প্রাধান্য পেয়েছে এক প( দ্বারা অন্য প(কে কোণঠাসা করার চেষ্টায়। দুই লাইনের লড়াইয়ের পরিণতি হয়েছিল দুই গোষ্ঠীর (মতাদখলের কামড়াকামড়িতে। ঠান্ডা মাথায় বিতর্ক চালিয়ে

প্রতিবিপ-বী লাইনের অনুসারক (অধিকাংশতই অসচেতন) সাধারণ নারী-পু(ষকে স্ব-মুক্তি( প্রক্রি(য়াতে ফিরিয়ে আনার পরিবর্তে, আক্র(মণাত্মক গা-জোয়ারি উগ্র বামপন্থা মাথাচাড়া দিয়েছিল। এ ব্যাপারে তারা গণ চেতনার স্তর সম্পর্কে কোনো চিন্তাভাবনা করেনি। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগের শক্তি( তাতে স্তিমিত হয়ে আসে। চীন যে আজ সমাজতন্ত্রের সাইনবোর্ডের আড়ালে সাম্রাজ্যবাদ ও দেশি পুঁজির মানব-হননকারী বিকাশের পথ খুলে দিয়েছে, সাংস্কৃতিক বিপ-বের ব্যর্থতা তার জন্য অনেকটাই দায়ী। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রে(িাপটে প্র(ে উঠেছে যে চীনের বিপ-ব 'সাংস্কৃতিক বিপ-ব'কে চালিয়ে নিয়ে যাবার উপযোগী নেতৃত্ব তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছিল কেন?

এই ব্যর্থতা একটি প্রাথমিক সিদ্ধান্তের দিকে আমাদের ধাবিত করে। তা হলো, সাংস্কৃতিক বিপ-ব, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ইত্যাদি নানা দিক থেকে উত্থিত হওয়া একটি শুদ্ধি-প্রক্রি(য়া চেতনা-গঠন প্রক্রি(য়া হিসেবে, চীনের সর্বহারাদের ব্যাপক বৌদ্ধিক অংশগ্রহণ ও হস্ত(েপের দাবি তৈরি করেছিল। কিন্তু এখানেও '*নীচু স্তর থেকে মেহনতি জনতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের*' জন্য প্রয়োজন নীচু স্তরের মেহনতিদের '*সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়ন*'। সাংস্কৃতিক বিপ-বের উগ্রপন্থা, উপদলীয়তা, আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা-জাত (মতার অপ-ব্যবহারকে '*অভিশাপ দেওয়া যায় বা নিন্দা করা যায়... কিন্তু যতদিন না ব্যাপক মেহনতি মানুষ সাংস্কৃতিক মানের একটি নির্দিষ্ট স্তরে উন্নীত না হচ্ছে ততদিন*' রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে '*রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংগঠনের*' পশ্চাদগতি তথা ধ্বংসের '*হাতিয়ার হিসেবে*' জনতার শোচনীয় সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতাকে কাজে লাগাতে পারে এবং সেটাই লাগিয়েছিল বিপথগামী প্রাক্ত(ন মুক্তি(সংগ্রামীবৃন্দ। সেকারণেই সর্বরিক্তে(র প(ে ব্যাপক বৌদ্ধিক হস্ত(েপ ও অংশগ্রহণ সম্ভব হয়নি।

মাও সঠিকভাবেই বলেছিলেন, জনতার জন্য যাবতীয় যা করা হবে তার সবই তাদের প্রয়োজন উদ্ভূত হতে হবে( অবশ্যই কোনো ব্যক্তি(র ইচ্ছানুযায়ী যেন তা না হয়, তা সে ব্যক্তি( যতই সু-উদ্দেশ্য পোষণ ক(ক না কেন। এটা প্রায়শই ঘটে যে বাস্তব অবস্থার দিক থেকে জনগণের একটি বিশেষ পরিবর্তনের প্রয়োজন, চেতনাগত হিসেবে তারা তখনো এই প্রয়োজনের ব্যাপারে সচেতন নয়, অথবা ঐ পরিবর্তন ঘটানোর জন্য তখনো ইচ্ছুক বা দৃঢ় প্রত্যয়ী নয়। এইসব ে(ত্রে ধৈর্যের সঙ্গে অপে(া করতে হবে আমাদের। আমরা ততকাল পর্যন্ত পরিবর্তন ঘটাবো না, যতকাল পর্যন্ত আমাদের কাজের মধ্যে দিয়ে জনতার অধিকাংশ এই প্রয়োজনটির ব্যাপারে চেতনাপ্রাপ্ত না হয় এবং এটার বাস্তবায়নে ইচ্ছুক বা দৃঢ়প্রত্যয়ী না হয়। অন্যথায় আমরা জনতা থেকে নিজেদের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ফেলবো... দুটো নীতি আছে এ ব্যাপারে ঃ *একটা হচ্ছে জনতার আসল চাহিদাগুলি, যেগুলো তাদের যা প্রয়োজন বলে আমাদের যে ধারণা তা থেকে আলাদা*। আরেকটি হলো জনতার ইচ্ছেগুলি, তাদের হয়ে আমরা যে তাদের মনকে সিদ্ধান্তে স্থির করে দিতে এগিয়ে যাই, তার পরিবর্তে *তর্কাতীতভাবে তাদের নিজেদের মন তাদের নিজেদেরকেই স্থির করতে দিতে হবে।*'' (*নির্বাচিত সংকলন মাও সে-তুঙ্*, ৩য় খন্ড( 'দ্য ইউনাইটেড ফ্রন্ট ইন কালচারাল ওয়ার্ক', ৩০-১০-১৯৪৪, পিকিং, ১৯৬৭, পৃ ১৮৬-১৮৭।

সেকারণেই নিপীড়িতদের উত্থান ঘটাবার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন 'নিপীড়িতের মন'কে চেনা-জানা-বোঝা। এব্যাপারে অনেকেরই সাহায্য নেওয়া যায়, তবে বিষয়টাকে সং(েপে খোলসা করে বলতে গিয়ে প্রথমে আমরা পল্লীসংস্কারক রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার দ্বারস্থ হবো। ১৮৯১ সালে নিজেদের জমিদারি দেখাশোনা করতে গিয়ে তিনি তীব্রভাবে গ্রামোন্নয়নের প্রয়োজন অনুভব করেন। তাঁর ভাবনা ছিল, যাদের উজ্জীবন তাঁদেরকেই এর মূল পরিচালক করে গড়ে তুলতে হবে। এই ল(্যে নানা রকমের পরী(া ও প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে তিনি দেখলেন (১) গ্রামীণ নারী-পু(ষের মন অভ্যাসের দাস( (২) মে(দন্ডহীন প্রাণীর মতো বেঁচে থাকেন তারা( (৩) কল্যাণকামী জমিদারদের উদ্যোগের সামনে তাঁরা ভিখারীর মতো ভি(াপাত্র নিয়ে নত হয়ে থাকেন( (৪) বড়লোকদের অত্যাচারের (মতা এবং কল্যাণ-বাসনা উভয়ের সামনেই বাধ্যতামূলকভাবে রিসেপশন-পয়েন্টে শতাব্দীর পর শতাব্দী দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁদের আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মবি(াস এবং সর্বাপে(া মারাত্মক হলো যে তাঁদের আত্মমর্যাদাবোধ একেবারে তলানিতে পৌঁছে গেছে( (৫) বাঁচাটা নিয়ম, তাই তাঁরা বাঁচেন, আর সব কিছুই 'নিয়তি' বা কপালের লেখা।

রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পরে সুদূর লাতিন আমেরিকায় নিপীড়িতদের জাগরণের উদ্দেশ্যে কাজ করতে গিয়ে পাওলো ফ্রেইরি-কেও সেই একই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তিনিও দেখলেন সহস্রাব্দের পর সহস্রাব্দ ধরে সমাজের উচ্চ ও মধ্যবর্গীয়রা অপরিসীম হিংস্রতায় নিপীড়িতদের 'বস্তু' (অবজেক্ট) হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে উচ্চবর্গীয়দের শতমুখ থেকে নিজেদের তুচ্ছতা অ(মতা অকৃতকার্যতার কথা শুনতে শুনতে নিপীড়িতরা যাবতীয় আত্মনিন্দা গভীরভাবে বি(াস করেছে এবং করে চলেছে। চেতনাগতভাবে কোনো সমস্যার মুখোমুখি হওয়া, সমস্যাটিকে গভীরভাবে বিচার করা এবং সমাধানকারী সক্রি(য়তাকে পরিচালিত করা যে তাদের (মতায় কুলোবে না এ ব্যাপারে তারা নিঃসন্দেহ। তারা মনে করে 'সর্দার', 'অধ্যাপক', 'শি(াবিদ'ই সবকিছু জানে, 'আমরা জানিনা।' রবীন্দ্রনাথের মতো পাওলো ফ্রেইরিও সেই দর্শনটির কথাই সজোরে উচ্চারণ করেন যে দর্শন বলে নিপীড়িতের উত্থানের রথের রশি

নিপীড়িতকেই টানতে হবে, না হলে অচলায়তন ভেঙ্গে কোনদিনই মুক্ত(ধারা প্রবাহিত হবে না।

এই প্রে( াপটে দাঁড়িয়ে যখন 'জনগণের ভয়ঙ্কর সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতা'র কথা আমরা শুনতে পাই, তখন তা আমাদের অপরিচিত বা অবি(াস্য লাগে না। তবে জনগণের সেই 'পিছিয়ে থাকা'টা কতটা অবধারিতভাবে আত্মধ্বংসী সেই ছবিটা আমাদের মতো করে মোটাদাগে ফুটিয়ে তুলতে গেলে আমরা শু( করতে চাইবো ভারতীয় আমজনতার অসম্ভব প্রিয় সিনেমা 'শোলে' থেকে বিশেষ দুটি দৃশ্যের কথা পাঠিকা-পাঠকদের পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে। দৃশ্য দুটি এরকম তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে দস্যু গব্বর সিং। তাকে তাড়া করে যাচ্ছে ঠাকুর বলদেব সিংহের ঘোড়া। একসময় ঠাকুর গব্বরের ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলে এবং শুধু এক হাত দিয়ে ধরে দস্যুর উর্দ্ধ(াস জোয়ান অ(টিকে টেনে মাটিতে শুইয়ে দেয়। পরবর্তীকালে, পাল্টে যাওয়া পরিস্থিতিতে ঠাকুরকে যখন নিজের কব্জায় কয়েদ করে ফেলে গব্বর, তখন সে বলেছিল যে ঠাকুরের বাহু যে কতটা শক্তি(শালী সে কথাটা হাড়ে হাড়ে তার জানা আছে। কেননা ঐ ভীমবাহু বায়ুবেগে ধাবমান তুরঙ্গমের লাগাম পাকড়ে তাকে ধূলিতে লুটিয়ে দিতে পারে। একটু হালকা মনে হলেও এর সঙ্গে তুলনা করে আমরা বলতে পারি ''লেনিন/মাওয়ের নেতৃত্বে বিদ্যুৎবেগে ছুটে যাচ্ছে নিপীড়িত নারী-পু(ষের সার্বিক-মুক্তি(র স্বপ্ন যুদ্ধা(— আর বারবার 'জনগণের ভয়ঙ্কর সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতা'র বাহু ঐ ছুটন্ত তুরঙ্গের বলগা টেনে ধরে তাকে ধুলোতে হিঁচড়ে ফেলছে। অ(ের হাঁটু ভেঙে গেছে, সুস্থ সাবলীল পুন(খান আপাতত অসম্ভব।''

এই উপলব্ধির প্রে( তেই বলা যায়, ঠিক যেমন বলেছেন পাওলো ফ্রেইরি তাঁর 'পেডাগজি অফ দি অপ্রেস্‌ড্ গ্রন্থে সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ হচ্ছে মেহনতি জনতা বিপ্-বী নেতৃত্বের সহগামী হয়ে মুক্তি(কামী সক্রি(য়তার পদ্ধতি-তত্ত্বের নির্মাণ ও অনুশীলনের অংশীদার হচ্ছে, কি হচ্ছে না( নিজেদের বাস্তবতার বিচার-বি(-ষণ করার পরিসরটুকু তারা পাচ্ছে, কি পাচ্ছে না( কতটা সহগামী-ভাবনা নির্দেশিত সক্রি(য়তায় লিপ্ত হয়ে তারা 'বিবেচ্য-বস্তুর' (অবজেক্ট) অবস্থান থেকে উত্তরিত হচ্ছে এবং ক্র(মশ আরো বেশি করে চেতনার স্তরে উঠে আসছে, সেইসব যাবতীয় প্র( ও বিষয়। নেতৃত্ব এখানে জনতার 'হয়ে' বা জনতার 'জন্য' ভেবে দেবে না। সহগামী 'কর্তব্য-সাধক' হিসেবে বিপ্-বী নেতৃত্ব ও নিপীড়িতরা হিংস্র বাস্তবতাকে পাল্টে দিতে যৌথভাবে বাস্তবতার উপরে সক্রি(য় হয়ে তত্ত্ব উদ্ভাবন করতে স( ম নয়। কেউ যদি এরকম একাকী প্রয়াসে উদ্যোগী হন, তিনি বা তাঁরা দরদী, সাহসী, বিদ্বান হতে পারেন, কিন্তু শেষ বিচারে তারা ফিলান্থ্রপিক, বিপ্-বী নন। আবার স্মরণ করি লুকাচের উপলব্ধি ঃ মার্ক্সবাদের কেন্দ্রীয় বিষয় 'সাবজেক্টিভিটি ওভারকামিং অবজেক্টিভিটি'। স্ব-গত সত্তা (বিয়িং-ইন-ইটসেল্ফ) থেকে স্ব-হেতু সত্তায় (বিয়িং-ফর-ইটসেলফ), মানবেতর থেকে মানবোচিত স্তরে উত্তরণ। ফ্রেইরি বলছেন ঃ যা মুক্ত( করে না, তা বিপ্-বই নয়।

আর ঠিক এই জায়গাতেই এসে দাঁড়ায় ফ্রেইরি-র 'পেডাগজি অব দ্য অপ্রেস্‌ড্' গ্রন্থটি এবং প্রাসঙ্গিক আরো কিছু গ্রন্থ। বইগুলোর লেখক ব্রাজিলের বিপ্-বী শি( াবিদ পাওলো ফ্রেইরি। ফিদেল কাস্ত্রো চে গুয়েভারাদের সঙ্গে নিপীড়িত মনুষ্যত্ব-রিক্ত(দেরকে বিবেকায়ন (পাওলো ফ্রেইরি 'বিবেকায়ন' বলতে যা বুঝিয়েছিলেন তা হল (১) সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বগুলোকে বোঝাবার ( মতা অর্জন করা এবং (২) বাস্তবের নিপীড়ক উপাদানগুলোর বি(দ্ধে উদ্যোগ গ্রহণ করা) ও মানবিকায়নের স্তরে উন্নীত করার 'ফর্ম' ও 'মেথড'-এর সহ-আবিষ্কর্তা ও চর্চাকারী বিপ্-বী।

গ্রন্থটির 'প্রাক্কথন' লিখতে গিয়ে রিচার্ড শল বলেছেন যে, চারটি সুবিস্তৃত অধ্যায়ে বিভক্ত( বইটির বহুমাত্রিক বহুকৌণিক প্রতিপাদ্যের সারসং( প গোটা কয়েক পৃষ্ঠার পরিসরে উপস্থিত করে ফেলা সম্ভবপর নয়। তাঁর কথা ধার নিয়ে আমরাও বলছি যে, 'পেডাগজি' ঠিক কী কথা বলছে সেটা বোঝা বিপ্-বী রাজনীতির জন্যে আজ একান্ত প্রয়োজন এবং সেই জায়গা থেকে তাঁর গোটা বইটাই তন্নিষ্ঠ পাঠ দাবি করে। মূলত ফ্রেইরি আবিষ্কৃত তলা থেকে ব্যাপক নিপীড়িত মেহনতিকে সর্বার্থে জাগিয়ে তোলার পদ্ধতি-তত্ত্বের রূপরেখা পাঠিকা-পাঠকের সামনে আমরা উপস্থাপিত করবো।

**r দুই**

*মুক্ত( দুনিয়া নির্মাণকারী-সক্রি(য়তার প্রয়োগ-তত্ত্ব গড়ে উঠবে কীভাবে?*

একটি হিংস্র বাস্তব দ্বারা সাধারণ নারী-পু(ষ নিপীড়িত হয়। সর্বহারা ও বিপ্-বী নেতৃত্বের প্রকৃত দায়বোধ যখন সেই বাস্তবকেই পরিবর্তনের কথা বলবে তখন সেই দায়বোধকে 'বদলে দেবার সক্রি(য়তার এমন কোনো তত্ত্ব' আবিষ্কার করতেই হবে, যে তত্ত্ব এই 'বদলে দেবার' প্রক্রি(য়াতে *জনগণের একটি মৌলিক ভূমিকার* কথা স্বীকার করতে ব্যর্থ হবে না। আর সেই ভূমিকা হলো নিজেদের সক্রি(য়তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে নেওয়া বিচার-বি(-ষণকারীর ভূমিকা (অর্থাৎ দায়িত্ব ও অধিকার)। বিবেচনা-বি(-ষণের সুযোগ না দিয়ে তাদেরকে শুধুমাত্র অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে ধরে নিতে পারে না নেতারা( তাহলে সে ব্যাপারটা তাদেরকে কেবল কর্ম-বিভ্রমে (ইল্যুইশন অব অ্যাকটিং) অনুমতি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না। বস্তুত সেটা হবে তাদেরকে ব্যবহার করে চলা এবং এই (ে ত্রে তারা 'ব্যবহৃত' হবে এমন ব্যক্তি(দের দ্বারা, 'জনগণকে ব্যবহার-করার-নীতির-শত্রু' হিসেবেই যাদেরকে ধরা হয়ে থাকে।

চিন্তাভাবনার ব্যাপারটা প্রধানত নেতৃত্বই সামলাবে আর

নেতৃত্বের সাথে ‘একমত’ হয়ে সত্রি(য়তার দিকে দৃঢ় পদ( পে এগিয়ে যাবে জনতা, এই মতবাদ হলো (জনতার জন্য) ‘অ্যাকটিভিজম’ বা ‘সত্রি(য়তাসর্বস্বতাবাদ’। তাই (জনতার (ে ত্রে) সত্রি(য়তাসর্বস্বতাবাদ (যা সঠিক-সত্রি(য়তা নয়) হলো বিপ-বের পথ— একথাটা বি্বাস করাও একটি প্রবঞ্চক প্রস্তাব। নারী-পু(ষ তখনই একমাত্র সত্যি অর্থে যুক্তি(গর্ভ বিবেচনাকারী হতে পারবে যখন তারা প্র্যাক্সিসের পরিপূর্ণতাকে জীবন্ত করে তুলতে স(ম হবে। তার মানে, তাদের সত্রি(য়তা একটি যুক্তি(গর্ভ বিবেচনা কর্মকে জড়িয়ে নেবে( আর এই বিবেচনা ত্র(মাগত বেশি বেশি করে তাদের ভাবনাধারাকে সংগঠিত করবে এবং এইভাবে বাস্তবতার ব্যাপারে একটি পুরোপুরি চেত-চৈতন্যহীন-বুঝবুদ্ধির পর্যায় থেকে উচ্চতর চেতনার স্তরের দিকে তাদেরকে পরিচালিত করবে। এটা এমন একটা স্তরের চেতনা যা তাদেরকে সমর্থ করবে সেই কারণগুলোকে অনুধাবন করতে যে কারণগুলো হিংস্র ও কনফিউজিং বাস্তবকে নির্মাণ করে। যদি বিপ-বী নেতৃত্ব বিবেচনার এই অধিকার সাধারণ নারী-পু(ষকে দিতে অস্বীকার করে, তাহলে তারা জনসাধারণের চিন্তাভাবনা করার নিজস্ব (মতারই ( তিসাধন করবে অথবা ন্যূনতম প( তাদের সঠিকভাবে চিন্তাভাবনা করার (মতাকে দুর্বল করবে। *জনগণকে ‘বাদ দিয়ে’ একা একা বা জনগণের ‘জন্যে’ বিপ-বী নেতৃত্ব ভাবনাচিন্তা করতে পারে না,* কেবলমাত্র জনগণকে ভাবনাচিন্তার সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করেই তারা এ কাজ করতে পারে।

অর্থাৎ নারী-পু(ষের ‘প্রকৃত’ কর্মতৎপরতা গড়ে ওঠে কাজ এবং বিচার-বি(-ষণ দুটো নিয়েই— আর প্রকৃত অর্থে এটাই হলো প্র্যাক্সিস বা অনুশীলন— এটাই হলো দুনিয়ার পরিবর্তন। এবং অনুশীলনের কাজ ও বি(-ষণের স্বার্থে যা দরকার, তা হল তত্ত্ব। যা তাকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে। নারী-পু(ষের কর্মতৎপরতার মানে হল তত্ত্ব এবং অনুশীলন, বিচার-বি(-ষণ এবং ত্রি(য়াশীলতা। শুধু তত্ত্বের আ( রিক অনুকরণে বা কেবল কর্মকান্ড-নির্ভরতাতে একে খাটো করে রাখা যায় না।

*‘সর্বরিক্ত(কে’ চেতনাগতভাবে রূপান্তরীকরণের পদ্ধতি-তত্ত্ব*

আর ‘বদলে দেবার’ প্রত্রি(য়াতে জনগণকে একটি মৌলিক ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য, অর্থাৎ যে কোনো খাঁটি বিপ-বের জন্য, জনগণের সাথে ‘ডায়ালগ’ বা কথোকথন হচ্ছে একটি মৌলিক প্রয়োজন। আজ বা কাল, একটি সঠিক বিপ-ব অবশ্যই জনসাধারণের সাথে একটি সাহসী কথোকথনে এগিয়ে আসবে। জনগণের কোনো বক্ত(ব্য, (মতায় তাদের ফলপ্রসূ অংশগ্রহণ ইত্যাদিকে বিপ-ব ভয় পেতে পারে না। বিপ-বের দোষত্রুটি, এর ভুলচুক, এর অসুবিধা, সমস্যাগুলো এবং এর অর্জনগুলো প্রসঙ্গে বিপ-বকে জনসাধারণের কাছে অবশ্যই উত্তরদায়ী হতে হবে, তাদের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে হবে।

কিন্তু দেখা যায় যে সাধারণ নারী-পু(ষের আস্থা জয় করার জন্য অভিজ্ঞ ও দরদী রাজনৈতিক দলীয় নেতৃত্ব আগেভাগেই পার্টি অফিসে বসে তুমুল পরিশ্রমী আলোচনার শেষে এমন একটি জনজাগরণী জনহিতৈষী পরিকল্পনা ছকে নিয়ে সেটা জনতার উপরে চাপিয়ে দিতে এগিয়ে যান, যে পরিকল্পনা নেতৃত্বের বি্বদৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিলে যায়, কিন্তু নিপীড়িতের বি(-ব্যাখ্যার সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। চাপিয়ে দেওয়ার এই পদ্ধতিকে পাওলো বলেছেন ‘ব্যাঙ্কিং মেথড’ বা গছিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে মগজের ভিতর জমা করে দেবার পদ্ধতি। নেতৃত্ব তার পাণ্ডিত্য এবং সংবেদনশীলতা দিয়ে নিপীড়িতের সত্রি(য়তার জন্য যে পথরেখা এঁকে যায়, সে পথরেখা অনুসরণে হয়ত বস্তুগত কিছু অধিকার অর্জন অথবা উপকারই হয়। কিন্তু আমরা যদি এর প্রকৃত তাৎপর্যের দিকে দল-সংস্কার মুক্ত( হয়ে তাকাই, তাহলে সম্যক উপলব্ধি করতে পারবো যে, আগে তারা ডানপন্থী মালিক সর্দারদের নির্দেশ মাথা পেতে মেনে নিতো, আর এখন মেনে নিচ্ছে বামপন্থী কমরেডদের মুক্তি(পণ-প্রাণিত সংগ্রামী ব্যবস্থাপত্র। তাতে ভিতরে নীরবে আত্ম-অনাস্থা গাঢ়তর হয়, বোধের উদয় এবং চেতনার পরিপক্কতা— একসাথে মিলে ভাবার অভ্যাস এবং সিদ্ধান্ত নেবার (মতা— রাজনৈতিক-সামাজিক (মতা-চর্চার ধারাবাহিক সহগামী অভিজ্ঞতা... এসব থেকে তারা বঞ্চিতই থেকে যায়। কেননা তাদেরকে বঞ্চিতই রেখে দেওয়া হয়, তবে আগে এটা করত শত্র(প( আর এখন এটা করছে শত্রু-পন্থার চর্চাকারী বন্ধুরা। প্রধানত এই কারণেই দেশে বিদেশে বিপুলাকার বাম দলগুলোর সমর্থক হিসেবে যে নিপীড়িত নারী-পু(ষের মহাস্রোতকে দেখা যায়, আনুমানিক চল্লিশ থেকে ষাট বৎসর পুরনো দলের নেতৃত্বের স্তরে কেন্দ্রীয় থেকে রাজ্য হয়ে জেলাস্তর পর্যন্ত সেই নিপীড়িত খেত-মজুর বা খাদান-শ্রমিক নারী-পু(ষের অংশীদারত্বের আনুবী( ণিক অনুপাতটি দেখলে বোঝা যায় যে, নিজেদেরই বাস্তব পরিস্থিতির ব্যাখ্যাকার-বি(-ষক হিসেবে এবং সে সব ব্যাখ্যা নির্দেশিত সত্রি(য়তা তরঙ্গের পরিচালক হিসেবে কোনো ভূমিকা-চর্চার পরিসর দশকের পর দশক ধরেই তাদের জন্য রাখা হয়নি বা মঞ্জুর করা হয়নি।

*এই পরিসর রাখার দাবিকে আবার বিভিন্ন (ে ত্রে পিছিয়ে থাকা ব্যক্তি(বর্গের জন্য সংসদে বা দলীয় কমিটিগুলোতে আসন সংর( ণের সঙ্গে এক করে দেখলে চলবে না।* কেননা সমাজ বদলের ল( ্যে পরিচালিত খাঁটি সত্রি(য়তার জায়গা থেকে নিশ্চেতনায় নিমজ্জিত নিপীড়িতকে সচেতনায় স্ব-হেতু সত্তায় যুক্তি(গর্ভ-চিন্তক তথা সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারীর (মতায় ত্র(ম-উত্তরিত তথা ত্র(ম-রূপান্তরিত করাটাই বিপ-বের কেন্দ্রীয় প্র্ন এবং সেই বিবেচনা থেকে এটা হলো বিপ-বী নেতৃত্বের অদ্বিতীয় ও প্রধানতম দায়িত্ব। এর সঙ্গে পিছিয়ে পড়া জাতি, গোষ্ঠী বা

শ্রেণীর জন্য ত্র(মাগত গণতান্ত্রিক চাপের বা বিতর্কের মাধ্যমে সহৃদয়তর করে তোলা সংসদে বা দলীয় কমিটিগুলোতে আসন সংখ্যা সংর( ণের বা সংরি(ত আসন সংখ্যা বাড়িয়ে যাবার দৃষ্টিকোণ এবং পদ্ধতি দুটোরই চারিত্রিক পার্থক্য স্পষ্ট, কোনোভাবেই গুলিয়ে ফেলা যায় না।

বিপ-বী সাংস্কৃতিক সত্রি(য়তার শা(েত অভিজ্ঞানটি হলো *(১) নিজেদের বাস্তবতাকে বি(েষণ বিবেচনা করার অধিকার উপভোগের এবং সে চর্চা-অভিযানে সহগামী সহায়ক হিসেবে নেতৃত্বকে পাবার স্বাভাবিক বা সম্পূর্ণ হক্ রয়েছে নিপীড়িতের( (২) সত্রি(য়তা তত্ত্বের গড়া-ভাঙ্গা এবং সেই তত্ত্বের অনুশীলনের ট্রায়াল অ্যান্ড এররের উপর যতটা দাবি ও দায় নেতৃত্বের, ততটাই দায়িত্ব এবং মালিকানা নিপীড়িতের।* ত্র(মমুক্তি(র এই যাত্রায় নেতৃত্বকে নিপীড়িতের স্তব্ধতার ঢাকনা খুলে দেবার সহায়ক হতেই হবে এবং শুধুমাত্র সহায়কই হতে হবে। এ কাজে একদম 'হা হারে রঙ্গিলা' বলে ছেড়ে দেওয়াও যেমন নেই, তেমনি 'চেপে ধরে চিরে ফেলে' সব বিদ্যা অনুপ্রবিষ্ট করানোও নেই। এই সাংস্কৃতিক-সত্রি(য়তা হচ্ছে সেই প্রত্রি(য়া যেখানে নিপীড়িত ''নারী-পু(ষ বুঝে নিতে পারে ও শিখে নিতে পারে কাকে বলে 'আত্ম-সত্তা' ('মি') এবং 'অপর-সত্তা' ('নট-মি'), যেখানে নিজেদের আত্মসত্তার বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে তাদের সম্পর্কটি তারা আবিষ্কার করে নিতে পারে।'' তাই শুধুমাত্র বিপ-বী নেতৃত্বের পৃথক-স্তরের চেতনা, বি(েষণ এবং সিদ্ধান্ত দ্বারা নিপীড়িতকে পথনির্দেশ দেবার পদ্ধতিটি আজ অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে।

মনুষ্যত্বের শেষ নির্যাসটুকু নিংড়ে নিয়ে সম্পূর্ণ রিক্ত( করে ফেলা সর্বহারাকে আত্মনির্ভর ও বিবেকায়িত করার উদ্দেশ্য ও চর্চাকে মূলত আঁকড়ে রাখার দর্শন ও পদ্ধতি-তত্ত্ব সেজন্যই আজ সর্বাপে(া গু(ত্বপূর্ণ। বারবার বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে এক মহাসাগর রক্তে(র বিনিময়ে বুঝতে হয়েছে যে (মতা হাতের মুঠোয় তুলে নেওয়া যায়, কিন্তু (মতাকে ধরে রাখতে হলে *'ব্যাপক জনগণের একেবারে তলা থেকে সর্বতোভাবে জাগরণের'* একটি পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তাকে আজ বিতর্কাতীত হিসেবে দেখতে হবে। যে পদ্ধতির অনুপস্থিতির পেছনেও থাকে বিপ-বের প্রধানতম ল(্যটিকে চর্চার স্তরে অবহেলার বা এমনকি একেবারে উপলব্ধিই করতে পারার অ(মতা। অতীতের বিশাল বিশাল কমিউনিস্ট আন্দোলনগুলো থেকে প্রাপ্ত সর্বাপে(া গু(ত্বপূর্ণ শি(াগুলোর অন্যতম প্রধান একটি হিসেবে এই বিশিষ্ট অভিজ্ঞতাটিকে চীনের সাংস্কৃতিক-বিপ-বোত্তর দুনিয়ায় বিস্মরিত হয়ে গেলে অধিকাংশ বামদলের সংগ্রামী ও আত্মত্যাগী নেতৃত্বের কাছে নিজেদের তৈরি করা লড়াকু কর্মসূচি নিয়ে ব্যাঙ্কিং মেথডের শরণাপন্ন হয়ে নিপীড়িতদের দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকে না। *শু( হয় নিপীড়িতের মনন-দাসত্ব চত্রে(র আরেক পাক*। এবার বন্ধুদের হাতে।

তাই আজ আমাদের মনে রাখতে হবে যে, *'সাধারণ নারী-পু(ষের সাথে কথোপকথন বা সংলাপ— কোনো উপহারও নয় বা কোনো বিশেষ-সুবিধাও নয়(* (তাছাড়া) এটা দমন করার জন্য একটি কৌশল হিসেবে খুব কমই ব্যবহৃত হতে পারে। কথোপকথন হলো দুনিয়াটাকে স্পষ্ট করে বুঝতে গিয়ে মানব-সমষ্টির মধ্যে স্পন্দমান আদান-প্রদান হিসেবে সাধারণ নারী-পু(ষের সত্যিকারের মানবিকায়নের জন্য একটি মৌলিক পূর্বশর্ত। সংলাপের মধ্যেই বিপ-বের মূল ন্যায্যতা নিহিত আছে।

যখন নিজেদের শব্দ উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীকে একটি অভিধায় চিহ্নি(ত করার মাধ্যমে সাধারণ নারী-পু(ষ দুনিয়ার রূপান্তর ঘটায়, তখন মানুষ হিসেবে যথার্থ তাৎপর্য অর্জনের জন্য জনতার সামনে একটি পথ হয়ে উঠে আসে ডায়ালগ। সংলাপ তাই একটি অস্তিত্বার্থক প্রয়োজনীয়তা। আবার *রূপান্তরিত ও মানবিকায়িত হবার জন্য অপে(মান পৃথিবীকে মাঝখানে বিবেচ্য বিষয় হিসেবে রেখে, কথালাপীদের ঐক্যবদ্ধ সত্রি(য়তা ও গভীর বিবেচনাতে মূর্ত হয়ে ওঠা আদান-প্রদান লড়াই দ্বন্দ্বকে* যেখানে বলা হচ্ছে সংলাপ (সেই অবস্থানে দাঁড়িয়ে) কোনো একজনের ধ্যানধারণা আরেকজনের ভিতরে জমা করে দেওয়ার স্তরে ডায়ালগকে অধঃপতিত করা যায় না। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা (বিচারহীনভাবে) যা 'গিলে ফেলবে' তেমন কোনো সাধারণ ভাবনা বিনিময়ও এটা হতে পারে না। অথবা যারা দুনিয়াকে কোনো নির্দিষ্ট অভিধায় আখ্যায়িত করার (ে ত্রে দায়বদ্ধ নয়, সত্যের অনুসন্ধানেও ব্রতী নয়, শুধুমাত্র নিজেদের লালন করা সত্যকে চাপিয়ে দেওয়াই যাদের ল(্য, তাদের মধ্যে যে শত্রুতাপূর্ণ মে(বিভাজিত বাদানুবাদ, তাকেও সংলাপ বলা যায় না। কারণ সংলাপ হচ্ছে দুনিয়াকে কোনো নির্দিষ্ট অভিধায় আখ্যায়িত করার কাজে উদ্‌গ্রীব নারী-পু(ষদের মধ্যে দেওয়া নেওয়া লড়াই দ্বন্দ্ব, এটা এমন কোনো পরিস্থিতি হতে পারে না যেখানে কিছু মানুষ অন্যদের হয়ে দুনিয়ার নামকরণ করে দিতে সচেষ্ট। এটা একটা সৃষ্টিমূলক কাজ( একজনের দ্বারা আরেকজনের উপরে দখলদারি চাপিয়ে দেবার কূট-কৌশলী অস্ত্র নয়। সংলাপে যে দখলদারির কথা আছে তা হলো পৃথিবীর উপরে কথালাপীদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার কথা। এর মানে হলো, নারী-পু(ষের শৃঙ্খল-মুক্তি(র জন্য বি(ে বিজয়।

অর্থাৎ সং(েপে কথালাপী সত্রি(য়তা-তত্ত্ব (১) এমন কোনো কর্তব্য-সাধকের কথা বলে না যে কর্তব্য-সাধক পরাভূতকরণের মধ্য দিয়ে অন্যকে দাবিয়ে রাখে( এবং (২) এই তত্ত্ব কোনো বিজিত বস্তুর কথাও বলে না। বরং উল্টে, ঐ তত্ত্বে কর্তব্য-সাধকেরা মিলিত হয় দুনিয়াটাকে ব্যাখ্যা বি(েষণ করতে, যার

উদ্দেশ্য হলো দুনিয়াটাকে রূপান্তরিত করা। পূর্ব-বর্ণিত কারণসমূহ অনুসারে, যদি কোনো ঐতিহাসিক মুহূর্তে নিপীড়িতরা তাদের দায়িত্বকে একজন কর্তব্য-সাধক হিসেবে সম্পাদন করতে সমর্থ না হয়, নিপীড়নের পরিস্থিতিটাকেই সমস্যা হিসেবে তখন তাদের সামনে তুলে ধরাটা (যেটা সমসময় কোনো না কোনো ধরনের কর্মোদ্যোগকে ধারণ করেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে) দায়িত্ব সুসম্পাদনে তাদেরকে সাহায্য করবে।

যত শীঘ্র সংলাপ শু( হবে, আন্দোলনটা তত শীঘ্র সঠিকভাবে বিপ-বী চরিত্র পেতে শু( করবে। সংলাপ, যা বিপ-বের জন্য মৌলিকভাবে জ(রি, সেটাই আবার আরেকটি মৌলিক প্রয়োজনের কথা বলে, আর তা হলো *একজন ব্যক্তি( তার সত্তার দিক থেকে পারস্পরিক চিন্তাবিনিময়কে পরিহার করলে প্রকৃত অর্থে 'মানুষ' হতে পারে না, কেননা প্রতিটি ব্যক্তি(-নারী বা ব্যক্তি(-পু(ষ হলো মৌলিকভাবেই বিনিময়-ভিত্তিক জীব। চিন্তা-বিবেচনার বিনিময়কে বাধা দেওয়া মানে হলো একজন ব্যক্তি(কে বস্তুর স্তরে অধঃপাতিত করা।* আর সে কাজটা নিপীড়কদের, বিপ-বীদের নয়।

*কথালাপী সক্রি(য়তা তত্ত্বে অবিশ্বাসীদের অবস্থানগুলো*

অন্যদিকে কিছু ব্যক্তি( যাদের উদ্দেশ্য ভালো কিন্তু পথ ভ্রান্ত, তারা মনে করে যে যেহেতু কথালাপী-প্রক্রি(য়াটি দীর্ঘ (কথাটা আসলে কিন্তু ঠিক নয়), তাই কোনো রকমের আলাপ-আলোচনা না করেই বিপ-বটা তাদের চালিয়ে যেতে হবে শুধুমাত্র অফিসিয়াল ঘোষণা-নির্দেশের সাহায্যেই। তবে একবার বিপ-বের কেন্দ্রীয় ল(্য অর্জনে চূড়ান্ত সফল হয়ে গেলে পরে (অর্থাৎ তাদের বিচারে রাষ্ট্র(মতা দখল হয়ে গেলে), তারপর তারা একটি সর্বব্যাপী পুঙ্খানুপুঙ্খ শি(াবিষয়ক উদ্যোগ গড়ে তুলবে। এই পদ্ধতিটিকে তারা আরো ন্যায্য করে তোলে এই কথা বলে যে 'মুক্তি(কামী শি(া'— (মতা দখলের পূর্বে সম্পাদন করা যায় না।

আসলে জনসাধারণকে সংগঠিত করা বা বিপ-বী (মতাকে শক্তি(শালী করা অথবা একটি যুক্ত(মোর্চা গড়ে তোলার ছুতোয় কথালাপকে এড়িয়ে যাওয়া এবং বিপ-বী প্রক্রি(য়াতে ঐ সহযোগকে অচ্ছ্যুৎ করে রাখার মূল কারণ হলো 'মুক্তি(র প্রতি ভয়'। এ হলো নারী-পু(ষের উপরে বিশ্বাসের ঘাটতি বা নারী-পু(ষকে বিশ্বাস করতে ভয়। *কিন্তু যদি নারী-পু(ষকে বিশ্বাসই করতে পারা না যায়, তাহলে মুক্তি(র তো আর কোনো প্রয়োজনই থাকে না।* এই (েত্রে বিপ-বটা এমনকি 'সাধারণ নারী-পু(ষের জন্য'-ও পরিচালিত হয় না, উল্টে এটা হয় নেতাদের জন্য জনগণের দ্বারা ঃ একটি আত্ম-অস্বীকারের বৃত্ত এইভাবে সম্পূর্ণ হয়।

বিপ-বের অজুহাতে বৈজ্ঞানিক-বিপ-বী-মনুষ্যত্ব নিপীড়িতকে বি(-ষণের জন্য বিবেচ্য-বস্তু হিসেবে ধরে নিয়ে (এবং সেই বি(-ষণের উপর নির্ভর করে) কীভাবে চলা কর্তব্য তার ব্যবস্থাপত্র উপস্থাপিত করতে পারে না। এটা করা মানে নিপীড়কদের মতাদর্শের অসংখ্য অতিকথার ('মিথ') একটি 'অজ্ঞতার সর্বসমাচ্ছন্নকরণ' ('দ্য এবসলিউটাইজিং অব ইগনোরেন্স')-এ পতিত হওয়া। এই অতিকথায় ধরে নেওয়া হয় এমন একজনের অস্তিত্বের কথা যে অন্যের অজ্ঞতার ব্যাপারে রায় দান করে। রায়দানকারী সেই একজন নিজেকে এবং তার শ্রেণীকে বর্ণনা করে সেই তাদের মতো যারা 'জানে' অথবা যেন 'জানার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছে'। এইভাবে সে অন্যদেরকে ভিন্ন গ্রহের সত্তা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। তার নিজের শ্রেণীর শব্দগুলোই শুধু (তার বিচারে) সঠিক শব্দ হিসেবে উঠে আসে, যা অত্যন্ত সৎ ও মমতাপূর্ণ উদ্দেশ্যেই সে চাপিয়ে দেবে বা চাপাতে চেষ্টা করে অন্যদের উপরে। অন্য বলতে নিপীড়িতরা, যাদের কাছ থেকে তাদের শব্দ চুরি করা হয়েছে। যারা অন্যের শব্দগুলি চুরি করে, তারা অপরের সামর্থ্যসমূহের উপর একটি গভীর সন্দেহ পোষণ করে এবং তাদেরকে অযোগ্য মনে করে। প্রত্যেকবার তারা তাদের শব্দ বলে— যাদেরকে কথা বলতে নিষেধ করেছে সেই তাদের (অর্থাৎ নিপীড়িতদের) কাছ থেকে একবারে কোনো উচ্চারিত শব্দ না শুনে। তারা এইভাবে '(মতায় অভ্যস্ত' হয়ে ওঠে বেশি বেশি করে এবং আদেশ, নির্দেশ ও পথপ্রদর্শনের ব্যাপারে একটি (চি ও আ(াদ অর্জন করে। আদেশ করবার মতো কাউকে না পেলে তারা বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে ডায়ালগ অসম্ভব।

উপরোক্ত( সিদ্ধান্তগুলোর কিছু মৌলিক অবস্থানের বি(-ষণ দরকার। এইসব লোকজন (বা এদের অধিকাংশই) জনগণের সাথে ডায়ালগের প্রয়োজনে বিশ্বাসী। কিন্তু (মতা দখলের আগে এই সংলাপ কার্যত সম্ভবপর হবে বলে তারা বিশ্বাস করে না। যখন তারা এই সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে যে (মতা দখলের আগে নেতারা (কথালাপ-পদ্ধতি তত্ত্ব অনুযায়ী) যুক্তি(গর্ভ-বিচারভিত্তিক শি(াপ্রক্রি(য়ার ধরনটাকে সাথে নিয়েই পথ চলতে পারে, তখন তারা আসলে *(১) বিপ-বের শি(ামূলক চরিত্র-বৈশিষ্ট্যকেই অস্বীকার করে( অর্থাৎ বিপ-ব যে সাংস্কৃতিক সক্রি(য়তার মধ্য দিয়ে 'সাংস্কৃতিক বিপ-বে' পরিণতি পাবার প্রস্তুতি চালাতে থাকে, সে সত্যটা তারা অস্বীকার করে। অন্যদিকে, (২) একবার (মতা দখল হয়ে যাওয়ার পরে যে নতুন শি(াপদ্ধতির প্রচলন হবে তার সঙ্গে তারা (মতা দখলের আগের পর্বের সাংস্কৃতিক সক্রি(য়তাকে গুলিয়ে ফেলে।* দেখা গেছে অনেক বিপ-বী নেতৃবৃন্দই জনগণের সাথে সম্পর্কের (েত্রে কথালাপের পথে চলতে পারে না। তারা হয় (ক) প্রভু-বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করে আছে এবং প্রকৃতার্থে বিপ-বী নয়, অথবা (খ) তাদের নিজেদের ভূমিকাকে বুঝতে সম্পূর্ণ ভুলভাবে পরিচালিত হয়ে চলেছে এবং (গ) নিজেরা নিজেদেরই সংকীর্ণ

গোষ্ঠীবাদের বশীভূত ও বন্দী হয়ে সমানভাবে বিপ্-বী সত্তাহীন হয়ে পড়েছে। তারা এমনকি ( মতাও দখল করে ফেলতে পারে। *কিন্তু সংলাপ-বিরোধী সত্রি(য়তা থেকে উৎসারিত যে কোনো বিপ্-বের তাৎপর্য পুরোপুরিভাবে সন্দেহজনক।*

যারা প্রকৃত মানবতাকে মূর্ত রূপ দেয় সেইসব বিপ্-বীদের পথা চলায়ও নানারকমের সমস্যা ও অসুবিধা থাকে। সেইসব অসুবিধা ও সমস্যা বিশেষ এক ধরনের নেতাদের (ে ত্রে আবার অনেক বেড়ে যায়, যারা (এমনকি সবচেয়ে ভালো উদ্দেশ্যসমূহ নিয়েও) 'জনগণের জন্য' বিপ্-বকে সম্পাদন করতে চেষ্টা করে। এইভাবে চেষ্টা করা আর জনগণকে বাদ দিয়ে বিপ্-ব সংগঠিত করা সমান কথা। কেননা, সাধারণভাবে যে সব প্রভুত্ববাদী পন্থা-প্রকরণ দ্বারা নিপীড়িত হয় নারী-পু(ষ, এ(ে ত্রেও সেইসব পন্থাপদ্ধতি দিয়েই (পরিবারের সদাশয় কর্তৃত্বের মতো) বিপ্-বী কর্মকাণ্ডে তাদেরকে টেনে আনা হয়।

*'বিপ্-বী নেতৃত্ব' ও ( মতা দখল*

বলা বাহুল্য যে কথালাপী সত্রি(য়তা-তত্ত্ব কখনোই একথা বলে না যে, বিপ্-বী নেতৃত্বের প্রয়োজন নেই। এটা শুধুমাত্র এই কথা বলে যে নেতারা— তাদের মৌলিক, অপরিহার্য, গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা সত্ত্বেও— জনগণের মালিক হতে পারে না ও *'মুক্তি(র' (স্যালভেশন) দিকে জনগণকে অন্ধের মতো এগিয়ে যেতে দিতে পারে না*। এ ধরনের একটি মুক্তি( বিপ্-বী নেতৃত্বের প( থেকে জনগণের প্রতি কেবলমাত্র একটি 'উপহার হয়ে দাঁড়াবে। এভাবে তাদের মধ্যে কথালাপের যে সংহতি সেটা ভেঙ্গে যাবে। কেননা, মুক্তি(কামী-প্রত্রি(য়ার সহ-সৃজনের মানবোচিত অবস্থান থেকে সরিয়ে দিয়ে, আত্মশক্তি(র জাগরণে অনেকটাই উন্মুখ হয়ে ওঠা জনগণকে এই প্রত্রি(য়ায় (ুদ্র তুচ্ছ বানিয়ে অধঃপতিত করে 'বস্তুতে' পরিণত করা হবে।

*তার মানে এই নয় যে বিপ্-বী নেতৃত্বের আলাদা কোনো ভূমিকা নেই।* (ইতিমধ্যেই অর্জিত) বিপ্-বী চেতনার জন্য, সাধারণ নারী-পু(ষের বাস্তব-অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞানের একটি স্তর থেকে ন্যায্যতই পৃথক একটি বিপ্-ব-জ্ঞানের স্তরের দাবি করতে পারে বৈজ্ঞানিক এবং হিউম্যানিস্ট বিপ্-বীরা। সেই জ্ঞান নিয়ে অবশ্যই জনগণের সাথে কথালাপে ঢুকবে তারা, যাতে বাস্তব সম্বন্ধে নারী-পু(ষের অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞান, নেতাদের যুক্তি(গর্ভ বিবেচনাজাত জ্ঞানের দ্বারা লালিত হয়ে, ত্র(মে ঘটমান হিংস্র 'উৎস-কারণসমূহের' আবিষ্কারক-বি(েষক জ্ঞানে রূপান্তরিত হতে পারবে।

এইবার, যেহেতু এটা অনস্বীকার্য যে *বিপ্-বের একটি শি( ামূলক চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আছে*, তাই কথাটাকে ধরতে হবে এই অর্থে যে— (১) যদি এটা মুক্ত( না করে তবে এটা বিপ্-বই নয়( এবং (২) বিপ্-বের প্রত্রি(য়াতে রাষ্ট্র-( মতা দখল আসলে একটি মুহূর্তের ব্যাপার, সে যতই চূড়ান্ত-নিষ্পত্তিমূলক বা নির্ধারক হোক না কেন। আর প্রত্রি(য়া হিসেবেই, বিপ্-বের 'আগের সময়টা' নিপীড়ক সমাজের ভিতরেই অবস্থান করে এবং এটা শুধুমাত্র বিপ্-বী-চেতনার কাছেই প্রতীয়মান হয়।

নিপীড়ক সমাজের ভিতরে একটি সামাজিক সত্তা বা অস্তিত্ব হিসেবে জন্ম নেয় বিপ্-ব। এটা যতদূর পর্যন্ত একটি 'সাংস্কৃতিক-সত্রি(য়তা', সে-সমাজে তার প্রজনন ঘটেছে সে সমাজ-সত্তার সামর্থ্য-সম্ভাবনাগুলোর প্রতি ততদূর সাড়া দিতে সে ব্যর্থ হতে পারে না। প্রতিটি সত্তাই নিজের ভিতরে উত্তরিত হয় (বা নিজের রূপান্তর ঘটায়) যার যার স্ববিরোধিতাগুলোর পারস্পরিক ত্রি(য়া প্রতিত্রি(য়ার মধ্য দিয়ে। যখন বাইরের শর্তগুলোর প্রয়োজন পড়ে, কেবলমাত্র তখনই সেই শর্তগুলো ত্রি(য়াশীল হয়ে উঠতে পারে, যদি ঐ সামর্থ্য ও সম্ভাবনাগুলোর সঙ্গে সেগুলো খাপ খেয়ে যায়। বিপ্-বের নতুনত্বের স্ফূরণ ঘটে সেই পুরনো নিপীড়ক সমাজের ভিতরেই। তাই, রাষ্ট্র-( মতা দখল ধারাবাহিক বিপ্-বী-প্রত্রি(য়ায় শুধুমাত্র একটি নির্ধারক মুহূর্তকে নির্মাণ করে। স্থবির বা গোঁড়া নয়, বরং বিপ্-বের প্রতি একটি বেগবান ও সচল দৃষ্টিকোণ থেকেই বলা যায় যে, *( মতা দখলের ব্যাপারে 'দখলের আগে, দখলের পরে' এরকম কোনো চূড়ান্ত বিভাজন-রেখা নেই।*

*'সাংস্কৃতিক সত্রি(য়তা' ( মতা দখলের পরে পরিণত হচ্ছে সাংস্কৃতিক বিপ্-বে*

উপরোক্ত( কারণসমূহের জন্যই ফ্রেইরি *বিপ্-বী প্রত্রি(য়াকে সংলাপ-তত্ত্ব অনুসারী সাংস্কৃতিক সত্রি(য়তা* হিসেবে দেখে থাকেন, যে সত্রি(য়তা (অ্যাকশন) একবার ( মতা দখল হয়ে গেলে পরে সাংস্কৃতিক বিপ্-বের মধ্যে সচল থাকে। দুই পর্যায়েই, বিবেকায়নের ল(্যে একটি সিরিয়াস এবং সবল প্রচেষ্টা জ(রি। এটা হলো সেই প্রয়োজনীয় মাধ্যম যার দ্বারা নারী-পু(ষ একটি সঠিক প্র্যাক্সিসের মধ্য দিয়ে বিবেচ্য-বস্তুর (মানব-অযোগ্য) অবস্থান থেকে উঠে এসে ইতিহাস-নির্দিষ্ট কর্তব্য-সাধনের অবস্থানে পৌঁছে যেতে থাকে।

সাংস্কৃতিক বিপ্-ব, সমগ্র সমাজের পুনর্গঠনের কাজটি হাতে নেবার সাথে সাথে পুনর্নির্মাণের ল(্যে নারী-পু(ষের যাবতীয় কাজকর্মকেও অন্তর্ভুক্ত( করে। কোনো যান্ত্রিক ধরনে সমাজকে পুনর্গঠন করা যায় না। এই পুনর্গঠনের মূল যন্ত্রটি হচ্ছে সেই সংস্কৃতি, যাকে বিপ্-বের মাধ্যমে সাংস্কৃতিকভাবেই পুনরায় সৃজন করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক বিপ্-ব হলো বিবেকায়নের জন্য বিপ্-বী যুগের সর্বাপে( া বড় প্রয়াস, একে পৌঁছোতে হবে প্রত্যেকের কাছে— তার (সেই নারী-পু(ষটির নিজস্ব) 'সাধন-কর্তব্য' যা-ই থাকুক না কেন।

এই পুনর্গঠনের পর্বে অবশ্যই ভুলে গেলে চলবে না যে, যে কোনো ধারার পেশাদার, তারা বি(্বিদ্যালয়ের স্নাতক হোক বা না হোক, প্রভুত্বকামী সংস্কৃতি দ্বারা তারা 'ওপর থেকে

নিয়ন্ত্রিত'। সেই নিয়ন্ত্রণই তাদের সত্তাকে দু'ভাগে বিভক্ত( করে দিয়েছে। তারা যদি সমাজের নীচের মহল থেকে আসে, এই ভুল শি(ার ব্যাপারটি একই থাকে, এমনকি অবস্থাটি আরো খারাপও হতে পারে। অথচ নতুন সমাজের পুনর্গঠনের জন্য এই পেশাদাররা প্রয়োজনীয়। তাদের মধ্যে অনেকে (১) মানবিকায়নের সক্রি(য়তায় ঢুকতে অনিচ্ছুক ও মুক্তি(-ভীতিতে ভুগছে এবং (২) আসলে অন্যসব ব্যাপার থেকে তুলনায় তারা অনেক বেশি বিপথে পরিচালিত( তবুও তাদেরকে কিন্তু বিপ-বী চিন্তা ও কর্মপ্রবাহ দিয়ে প্র্যোতীতভাবেই পুনরধিকার করে ঐ বিপথ থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। আর এটা যে শুধু করাই যায় তা-ই নয়, এটা করাই বিপ-বের দায়িত্ব।

এই পুনরাধিকারের প্রয়োজনে, বিপ-বী নেতারা, আগের ডায়ালজিক্যাল সাংস্কৃতিক সক্রি(য়তা থেকে এগিয়ে এসে, 'সাংস্কৃতিক বিপ-বের' সূচনা করবে। এই স্তরে, যারা সাধারণ নারী-পু(ষকে অস্বীকার করতে চায় তাদেরকে মোকাবিলা করার কাজটি হচ্ছে অপরিহার্য অ-বিকল্প কর্তব্য। কিন্তু এই ভূমিকাকে ছাড়িয়ে আরো এগিয়ে যেতে হবে বিপ-বী (মতাকে। যারাই সমাজকে পুনর্গঠন করতে চায় তাদের সকলকে অংশগ্রহণ করার জন্য পরিষ্কার আমন্ত্রণ জানাতে হবে এবং এই কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে একটি নতুন ও আরো সাহসী স্তরে এবং অবস্থানে যেতে হবে। এই বিবেচনায় *সাংস্কৃতিক বিপ-ব হল ডায়ালজিক্যাল সাংস্কৃতিক সক্রি(য়তার অবশ্যম্ভাবী ধারাবাহিকতা—* যে সাংস্কৃতিক সক্রি(য়তার দায় বিপ-ব (মতায় পৌঁছানোর পূর্বে সন্দেহাতীতভাবেই পালন করা দরকার।

চূড়ান্ত বিচারে (১) সাংস্কৃতিক বিপ-ব নেতা এবং জনসাধারণের একটি স্থায়ী কথালাপের অভ্যাসকে বিকশিত করে( (২) *(মতাতে জনতার অংশীদারত্বকে পাকাপোক্ত( করে।* এই পথে যেহেতু নেতা ও জনতা উভয়েই যুক্তি(গর্ভ-বিবেচনা অনুসারী কর্ম-ধারা (ক্রি(টিক্যাল অ্যাকটিভিটি) চালিয়ে যেতে থাকে, *বিপ-ব তখন অনেক সহজে আমলাতান্ত্রিক ঝোঁকগুলো (যা নতুন ধরনের নিপীড়নে পরিণত হয়) এবং হানাদারির (যা সবসময়েই একই থাকে) বি(দ্ধে নিজেকে র(া করতে পারে।* সেই হানাদার— (বুর্জোয়া সমাজেই হোক আর বিপ-বী সমাজেই হোক) সে কৃষিবিদ বা সমাজতাত্ত্বিক, একজন অর্থনীতিবিদ বা একজন জনস্বাস্থ্যকর্মী, একজন পুরোহিত বা পাদ্রী, একজন শি(াবিদ বা একজন সমাজকর্মী, অথবা বিপ-বী— যে কেউ হতে পারে।

*শেষ কথা আপাতত*

'সাধারণ নারী-পু(ষের ডায়ালগের ব্যাপারে কোনো অভিজ্ঞতা নেই'— এই ছুতোতে যদি (মতা দখলের আগে জনসাধারণের সাথে ডায়ালগে যাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে সেইসব সাধারণ নারী-পু(ষের (মতায় আসাও সম্ভব হবে না। কেননা তারা (মতাকে ব্যবহারের ব্যাপারে আগের মতো এখনো সমানভাবেই অনভিজ্ঞ থেকে যাবে। বিপ-বী প্রক্রি(য়া হচ্ছে বেগবান ও সচল। এই ধারাবাহিক সচলতার মধ্যেই, বিপ-বী নেতৃবৃন্দের প্র্যাক্সিসের হাতে সাধারণ নারী-পু(ষের প্র্যাক্সিসের হাত জড়িয়ে নিয়ে, সাধারণ নারী-পু(ষ ও বিপ-বীরা উভয়েই শিখে নেয় ডায়ালগ এবং (মতার প্রকৃত ব্যবহার (এটা বলা ততোটাই অনিবার্য যতটা অবশ্যম্ভাবিতায় বলা যায় যে *একজন মানুষ জলে সাঁতার শেখে, লাইব্রেরিতে নয়*)।

বিপ-ব, কিছু অবজেক্টিভ শর্তের উপরে দাঁড়িয়ে জন্ম নিয়ে, মুক্তি( চর্চার ধারাবাহিকতায়, সাধারণ নারী-পু(ষের একটি সমাজের সূচনার মধ্য দিয়ে নিপীড়নের পরিস্থিতিকে অতিক্র(ম করে যেতে চায়। বিপ-বের শি(াগত এবং ডায়ালজিক্যাল বৈশিষ্ট্যটি, *যা বিপ-বকে একই সঙ্গে একটি 'সাংস্কৃতিক বিপ-ব' হিসেবে গড়ে তোলে,* সে বৈশিষ্ট্যকে আবশ্যিকভাবে বিপ-বের প্রতিটি স্তরে উপস্থিত থাকতে হবে। *একটি প্রতিবিপ-বী আমলাতন্ত্রে এবং প্রাতিষ্ঠানিকায়িত ও স্তরবিন্যাসে অধঃপতিত হয়ে পড়ার হাত থেকে বিপ-বকে র(া করার জন্য এই শি(ামূলক-বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে ফলপ্রসূ র(া-কবচগুলোর একটি( কেননা প্রতিবিপ-ব সেইসব বিপ-বীদের দ্বারাই বাস্তবায়িত হয় যারা প্রতিক্রি(য়াশীল হয়ে যায়।*

*অ্যালবার্ট আইনস্টাইন থেকে মার্তা হার্নেকর*
*মুক্তি(যাত্রার বয়ানকারী*

রাষ্ট্র(মতা দখলের পর সে সমস্যাগুলো বারবার নানা দেশে সমাজতন্ত্রের বাস্তবায়নকে পঙ্গু করে দিয়েছে, সেসব সমস্যার কারণ অন্বেষণ এবং আরোগ্য-পদ্ধতির আবিষ্কার যে কত গভীরভাবে জ(রি সে কথাটা উপলব্ধি করেছিলেন প্রবাদ-প্রতীম বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ঃ

> আমার দৃঢ় বি্াস, এইসব ভয়ানক অশুভ ব্যাপারগুলি দূর করার একটিই পথ আছে, তা হল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত করা, যাতে যুক্ত( থাকবে এমন এক শি(া-ব্যবস্থা যা সামাজিক ল(্যের অভিমুখে চালিত হবে। এরকম একটি অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা থাকবে সমাজের নিজের হাতেই আর তা পরিকল্পিত পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হবে। সমাজের চাহিদার সঙ্গে উৎপাদনের সমাঞ্জস্য বিধান করতে পারবে এমন এক পরিকল্পিত অর্থনীতি সমস্ত কর্মদ( ব্যক্তি(র মধ্যে কাজ বণ্টন করে দেবে ও প্রতিটি নারী পু(ষ ও শিশুকে জীবিকার নিশ্চয়তা দেবে। আমাদের *বর্তমান সমাজের মতো (মতা ও সাফল্যকে মহিমান্বিত করার পরিবর্তে* সমাজতান্ত্রিক শি(া ব্যক্তি(র অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে বিকশিত করে তোলার সাথে সাথে তার মধ্যে সাথী মানুষদের প্রতি দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা করবে।
>
> এতৎসত্ত্বেও, এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে পরিকল্পিত

অর্থনীতি মানেই সমাজতন্ত্র নয়। আ( রিক অর্থে পরিকল্পিত অর্থনীতি হয়তো ব্যক্তি(কে দাসত্বের শৃঙ্খলেও আবদ্ধ করে ফেলতে পারে। সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কতকগুলি অত্যন্ত কঠিন সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান দাবি করে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক (মতার সুদূরপ্রসারী কেন্দ্রীভবনের পরিপ্রে(িতে *আমলাতন্ত্রের সর্বশক্তি(মান, উদ্ধত দাম্ভিক রূপ পরিগ্রহণ প্রতিহত করা কীভাবে সম্ভব? ব্যক্তি(র অধিকারগুলি কিভাবে সুর(িত করা যাবে?* আর তার সাথে আমলাতন্ত্রের (মতার বিপরীতে গণতান্ত্রিক মানদণ্ডকে কীভাবে সুনিশ্চিত করা যাবে?

১৯৪৯-এর মে মাসে ইংরাজিতে মুদ্রিত *মান্থলি রিভিউ* পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের 'সমাজতন্ত্র কেন?' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিলো, শ্রী নারায়ণ সরকার কর্তৃক বাংলায় অনুদিত সেই রচনাটি থেকে আমরা এখানে শুধু দুটো অনুচ্ছেদ ব্যবহার করলাম। এই উদ্ধৃতি তুলে ধরে আমরা দেখাতে চাইছি যে শুধু রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বা ব্যক্তি(ত্ব নয়, ভিন্ন ধারার মনীষীদের কাছেও সোভিয়েতের আমলাতন্ত্রের দাম্ভিক উদ্ধত রূপ চোখে পড়েছিলো। সেই পরিপ্রে(িতে সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি(র অধিকার এবং গণতন্ত্রের মানদণ্ডকে কীভাবে নিশ্চিত করা যায় তা নিয়ে তাদের প্রগাঢ় উদ্বেগ ও সম্ভাব্য-সমাধানের পরামর্শ তারা গোপন রাখেন নি।

১৯৪৯-এর মে মাসের পরে একটি অর্ধ-শতাব্দীর পর আরো দশ বছর সময় পেরিয়ে গেছে। সময়ের হাত ধরে এবারে আমরাও চলে আসবো বর্তমানে। এখানে একেবারে আজকের আরেকজন বিরল মেধাবী ব্যক্তি(র প্রাসঙ্গিক বক্ত(ব্য আমরা তুলে ধরবো, তিনি লুই আলথুজারের ছাত্রী এবং আশিটিরও বেশি পুস্তকের লেখিকা মার্তা হার্নেকর (তার প্রতিটি বই ইন্টারনেটে *www.rebelion.org* সাইটে পাওয়া যায়)। তিনি স্প্যানিশ ভাষায় লেখা তাঁর *লাতিন আমেরিকা ও একবিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্র ঃ ভ্রান্তি এড়াতে নতুন পথের সন্ধান* গ্রন্থের ভূমিকাতে বললেন— ''বামপন্থীদের পরিপক্ক হওয়ার প্রক্রি(য়ায় প্রভাব ফেলেছে এরকম আরো দুটো উপাদান এখানে উল্লেখ করতে চাই (যদিও আমরা আপাতত একটি উপাদানই এখানে উল্লেখ করবো— রচনাকার)। প্রথমটি শি(া বিষয়ে ব্রাজিলের শি(াবিদ পাওলো ফ্রেইরির দৃষ্টিভঙ্গি। এ দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের কয়েকটি দেশে গু(ত্বপূর্ণ গণশি(া আন্দোলন গড়ে তোলে। এ দৃষ্টিভঙ্গি সে সময়কার ভ্যানগার্ড বা অগ্রবাহিনীর অংশ হিসেবে বামপন্থী দলগুলোর ধ্রুপদী ধারণার বিপরীত। এসব দল এটাই মনে করতে অভ্যস্ত ছিল যে তারাই সত্যের মালিক।'' (আশীষ লাহিড়ী সম্পাদিত *বাংলা মান্থলি রিভিউ*, ডিসেম্বর ২০১০, পৃ ২৫)। পাওলো ফ্রেইরি উদ্ভাবিত মুক্তি(র ল(্যে পরিচালিত বিপ্-বী সক্রি(য়তার প্রয়োগ বা পদ্ধতি-তত্ত্ব নিয়ে লাতিন আমেরিকার মেহনতি মানুষের ভিতরে বিভিন্ন রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সংগঠন যে এই মুহূর্তে কাজ করে চলেছে তার স্বীকৃতি সদ্য প্রকাশিত এই বই। মার্তা হার্নেকারের ব্যাখ্যার সবটা আমরা না-ও মানতে পারি। তবে বিগত শতাব্দীর কৈশোরে লেনিন স্তালিন দ্বারা নির্ণীত বিপ্-বের শরীরের ভিতরের রোগ-চিহ্ন( অর্থাৎ আমলাতন্ত্রের বিষ-সর্প এবং জনতার ভয়ংকর সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতার কথা যখন পরবর্তীকালে আইনস্টাইনের উপলব্ধির মধ্য দিয়েও প্রতিধ্বনিত হলো, শতাব্দী তখন তার মাঝবয়সে উপনীত হয়েছে( এরপর নীল-মিসিসিপি-ভলগা দিয়ে অনেক তরঙ্গের উত্থান ও পতন ঘটেছে, কিন্তু আজো লেনিন স্তালিনের রোগ নির্ণয় যে ভ্রান্ত ছিল সে কথা কেউ প্রমাণ করতে পারেনি। আজকের লাতিন আমেরিকা পাওলো ফ্রেইরি-কে ধরে ঐ দুর্দমনীয় রোগের বি(দ্ধেই যে লড়াই করতে চাইছে, (এটুকু বলা যায় যে) মার্তা হার্নেকরের উক্তি( সেই বাস্তবতাকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করছে। কোনো সফলতার কথাই যেহেতু আগে থেকে নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যায় না, তেমনি লাতিন আমেরিকান মুক্তি(-চর্চা কোথায় পৌঁছোবে এই মুহূর্তে সে কথাটি বলা হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু তাদের প্রয়াসে 'জনতার ভয়ংকর পশ্চাদপদ সাংস্কৃতিক চেতনা' যে একটি অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ চর্চা-স্থানে অধিষ্ঠিত, সে কথা বোধহয় মনে করা যেতে পারে।

শেষ করার আগে কিছুটা বিপন্ন একটি বিস্ময় প্রকাশ না করে পারছি না ঃ ১৯৭০-এ 'পেডাগজি'-র ইংরাজি সংস্করণ প্রকাশের পর আজ চল্লিশ বৎসর অতিক্র(ান্ত... পুরোপুরিভাবে ভুল প্রমাণিত করতে বা আংশিক গ্রহণ/বর্জনের জন্য হলেও গ্রন্থস্থিত চিন্তাধারাকে বাংলাভাষী বামপন্থী চিন্তাজগতের আলোচনার টেবিলে রাখা দরকার ছিলো না কি? প্র(া জাগে, অতীতের প্রতিটি বিপ্-বের জন্য শত-কোটি নারী-পু(ষের যে আত্মত্যাগ, তা কি পুরনো পরী(িত পথগুলোর ব্যাখ্যা বিবেচনা করার পাশাপাশি নতুন আরেকটি পথের সন্ধানে ও সে পথ থেকে নির্বাচিত কিছু আরোগ্য-নিদানের সংযোজনে এগিয়ে যাবার কোনো প্রয়োজনকেই প্র(াতীতভাবে জ(রি হিসেবে হাজির করে না? এত দরদ-সাহস-কান্না-স্বপ্নভঙ্গ, ঘরে ও পথে এত এত প্রত্য( ও পরো( যোদ্ধার শহিদত্ব আমাদের হৃদয়কে 'জনগণের ভয়ংকর সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতা' নামক মারি-বীজটির নিরাময়কারী বিশল্যকরণীর সন্ধানে গন্ধমাদন তোলপাড় করতে বলে না!

আশা করবো যে নিশ্চয়ই এ প্র(ের উত্তর আছে। উত্তরের আশাতেই আমজনতার এক অর্বাচীন পাঠকের হাতে (কেবলমাত্র নিজের পাঠকসত্তার তাড়নাতে ভুলে শুদ্ধে) এই লেখার নির্মাণ।

# বিজ্ঞান, দর্শন ও সমাজ

**জয়ন্ত দাস**

আশীষ লাহিড়ীর লেখা 'ভগবানের লেত্তি— ঈ্বের না-ঈ্বের বিজ্ঞান সমাজ' বইটি এই ২০১১ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছে। *গাঙচিল* বেশ কিছু বছর ধরে বিভিন্ন গু(গম্ভীর বিষয়ে ভাল ভাল বই বের করে আসছেন, এটি তাদের অন্যতম। তবে কিনা সুখের বিষয় একটাই যে লেখকমশাই গু(গম্ভীর বিষয় মাত্রেই 'হুঁকোমুখো হ্যাংলা'র ভাবভঙ্গি নিয়ে কথা বলতে হবে এমন বি্বাস করেন না, এবং বাংলাভাষায় কীভাবে অপে(াকৃত অপরিচিত বিষয়গুলিকে পরিবেশন করতে হয় সে ব্যাপারে তাঁর কিঞ্চিৎ মুন্সিয়ানা আছে।

এই বইটি একটি বিষয়ে একটানা লিখে যাওয়া বই নয়, এটি হল অনেকগুলো ছোটো ছোটো লেখার সমাহার। ছোটো লেখা হিসেবে প্রতিটি লেখাই সুখপাঠ্য, এবং প্রামাণিকও বটে। এই লেখাগুলি আগেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে একটা অন্তর্লীন ধারাবাহিকতা রয়েছে, যদিও কিছু প্রবন্ধ যেন তুলনায় খাপছাড়া লাগে। তবে সেটা গৌণ ব্যাপার, বইটি পড়তে পড়তে মনে হয় যেন একই বিষয় বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে দিয়ে তরতর করে এগিয়ে চলছে। প্রতিটি লেখা নিয়ে আলাদা আলাদা করে আলোচনার পরিসর এখানে নেই, তাই ছোটো করে তাঁর আলোচনার মূল ঝোঁকটিকে ধরার চেষ্টা করব।

আধুনিক পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান তার বিকাশের আদিতে ছিল দর্শনের একটি ধারা, তাকে তখন যে নামে ডাকা হত তা হল 'প্রাকৃতিক দর্শন' (Natural Philosophy)। বর্তমান অর্থে ব্যবহৃত 'বিজ্ঞান' কথাটি পরের যুগের আমদানি। দর্শনের একটি শাখা— এ-অবস্থা থেকে বিজ্ঞানের নিজের আলাদা ঠাঁই করে নেবার পথে নেহাত কম ঠোকাঠুকি বাধেনি। আশীষ লাহিড়ী বলেছেন, ষোড়শ শতকে ইংরেজ ফ্রান্সিস বেকন আর ফ্রান্সের রেনে দেকার্ত— এঁরা বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের যথার্থ এবং তার প্রয়োগ-সম্ভাবনা নিয়ে দর্শনেরই এক বিতর্ক তুললেন। তাঁদের দর্শন আজকের বিচারে ভ্রান্তিমুক্ত( নয়, ভ্রান্তিমুক্ত( হবার কথাও নয়। কিন্তু এদের অবদানে পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানচর্চার অপে(াকৃত পরিচ্ছন্ন একটি (েত্র গড়ে উঠল। আজকের ভাষায় যাকে ভাববাদ বলি, বেকন বা দেকার্ত-এর দর্শন কিন্তু তার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারল না, সত্যি কথা বলতে কি, বেরিয়ে এসে সে-দর্শন বোধকরি টিকতেও পারত না। ভাববাদের কূলল(ণ হলো, চেতনাই প্রধান, মনুষ্যচেতনার বাইরে জগতের বাস্তব অস্তিত্ব নেই বা অজানা— এই তত্ত্বটি। এরকম তত্ত্বের সরাসরি আলোচনা বেকন ও দেকার্তের লেখাতে সেভাবে এল না। কিন্তু তাঁরা বিজ্ঞান-দর্শন বিজ্ঞান-পদ্ধতির বাইরে 'পরম সত্য'-এর অবস্থান স্বীকার করে নিলেন, 'পরম কারণ' হিসেবে ঈ্বেরের অবস্থান ও জগতের বিভিন্ন ঘটনায় তাঁর হস্ত(েপের জায়গা ছেড়ে রাখলেন। তবু, দৈনন্দিন কাজের জগতে ঈ্বেরের হাত লাগানোর প্রয়োজন কমে গেল, দেকার্তের ও বেকনের পদ্ধতিতে যুক্তি(-তর্কের ও পরী(া-নিরী(ার মধ্যে দিয়েই জাগতিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যার দ্বার উন্মুক্ত( হয়ে গেল।

এইরকম একটা অবস্থায় রঙ্গমঞ্চে নিউটনের প্রবেশ ঘটল। তিনি দর্শন নিয়ে আলাদা করে বেশি কিছু বলে না গেলেও বেকন ও দেকার্ত, এ-দুজনের দর্শন ও পদ্ধতিতন্ত্র তাঁর হাতেই ফলিত রূপটি পেল। নিউটনীয় বিজ্ঞান এমন শক্তি(শালী এক সামাজিক হাতিয়ারের জন্ম দিল যে পাশ্চাত্য সভ্যতা এই নয়া-সাবালক বিজ্ঞানের হাত ধরে বি্বজয় করতে বেরিয়ে পড়ল। বি্বজয়ের ফলে হাতে-গরম পুরস্কার সাম্রাজ্যটি তো পাওয়া গেলই, তার সঙ্গে উপরি যেটা এল তা হল পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান ও তারই সঙ্গী প্রযুক্তি(— এই জুড়ির অ্বমেধের ঘোড়া আটকানোর বৌদ্ধিক বা বাস্তব (মতা আর কারোর রইল না।

এই ঈ্বের-প্রতিদ্বন্দ্বী বিজ্ঞান গড়ে উঠল বটে, কিন্তু আশীষবাবু দেখাচ্ছেন, তার মহানায়কেরাও অলৌকিকতার স্পর্শশূন্য, স্বয়ংসম্পূর্ণ এক মহাবি্বের ধারণা গড়ে তোলার স্পর্ধা দেখাতে পারলেন না। নিউটন স্বয়ং বললেন, দেশ (স্পেস অর্থে), আমাদের ধারণা-নিরপে( চরম সত্য, কেন না দেশ হল 'ঈ্বেরের চেতনাপীঠ'। আইনস্টাইন শ দুয়েক বছর পরে এসে নিউটনীয় এই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করবেন, কিন্তু ইত্যবসরে বাঘা বাঘা পণ্ডিতেরা চেষ্টা চালালেন ঠিক কী করে ঈ্বেরের অস্তিত্বের সঙ্গে নিয়মের নিগড়ে বাঁধা বি্বটিকে খাপ খাওয়ানো যায়। ধাঁধাঁটা হলো এই, যদি ঈ্বের সর্বশক্তি(মানই হন তো বি্ব কতকগুলো বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যেই চলবে কেন? ঈ্বের তো যখন-তখন হস্ত(েপ করে উচিত কাজগুলো (যথা বি্বাসীদের পুরস্কার আর নাস্তিকদের আগুনে সেঁকা) করতে পারেন, তাঁকে সেরকমটি করতে দেখা যায় না কেন?

এর একটা ব্যাখ্যা দাঁড়ালো এইরকম যে ভগবান বি্বজগত সৃষ্টি করেছেন, তার নিয়মগুলোও বানিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু

---

*ভগবানের লেত্তি—ঈ্বের না-ঈ্বের বিজ্ঞান সমাজ*—আশীষ লাহিড়ী, গাঙচিল, ১৭৬ পাতা, ১৭৫ টাকা

তারপরে তিনি বিশ্বের দৈনন্দিন কাজ-কর্মে হস্তক্ষেপ করছেন না। আশীষবাবুর ভাষায়, মান্না দে-র গান—'ঘুরিয়ে দুনিয়ার লাট্টু, ভগবান হারিয়েছে লেত্তি'— সেটাই একটু গম্ভীর সুরে গেয়ে দর্শন বলে চালিয়ে দেওয়ার ব্যাপার। এই মতটাই পাশ্চাত্যে প্রতিষ্ঠা পেল ডীইজম নামে। টম পেইন, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, আর আমাদের বাংলায় অক্ষয় দত্ত মশাই— এঁরা ডীইজম-এরই বিভিন্ন রূপে মজেছিলেন। কিন্তু লেত্তিটাই যদি হাত থেকে ফস্কে যায় তো সে ভগবানের পক্ষে ভগবানত্ব বেশিদিন ধরে রাখা শক্ত, তাই ডীইস্টদের পক্ষে নাস্তিক হয়ে পড়া স্রেফ একটি ছোট্ট তুড়িলাফের মামলা।

আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ উলটো জায়গা থেকে যাত্রা আরম্ভ করেও পাশ্চাত্যে 'অভিজ্ঞতাবাদ'-এর অন্যতম জনক, বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক জন লক ডীইস্ট দৃষ্টিভঙ্গির খুব কাছাকাছি এসে পৌঁছলেন। তিনি প্রথমে এই বলে শুরু করলেন যে আমরা কোন জিনিসকে প্রকৃতভাবে জানিনা, কেননা আমাদের মনের মধ্যে জিনিসটির একটি ছায়া পড়ে, আমাদের জ্ঞান ওই ছায়াটুকুতেই সীমাবদ্ধ। এদিকে একজন বিজ্ঞানী ও ডাক্তার হিসাবে তিনি বিলক্ষণ বুঝেছিলেন, 'ছায়া'টুকু নিয়ে আমাদের যা বোঝা তা দিয়েই বাইরের জগতটাকে দিব্যি প্রভাবিত করা যায়। চিকিৎসক হিসাবে জন লক যা করতেন তাতে তাঁকে বস্তুজগতের কিছু ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে বলতে হত রোগীর কী হবে, আর বস্তুজগতেরই কিছু জিনিস, তা সে ওষুধ-বিষুধই হোক আর অস্ত্রোপচাররই হোক, করে তাঁকে রোগীর বাস্তব অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাতে হত। সুতরাং বস্তুর ছায়াটুকুই আমরা জানি, বস্তুর সঙ্গে তার ছায়ার সম্পর্ক আমাদের ধারণার অতীত, এমন কথা তাঁরই মানসসন্তানঅভিজ্ঞতাবাদের প্রাথমিক ধারণার যৌক্তিক পরিণতি হলেও তিনি তা বলতে পারলেন না। তাঁকে বলতে হল, আমরা প্রকৃত বস্তু সম্পর্কে সরাসরি কিছু জানি না বটে, কিন্তু আমাদের মনে যা গড়ে ওঠে তা বস্তুর এক সদ্-বিম্ব, তা আমাদের প্রতারিত করে না। কেননা যে প্রতারিত করে না সেটা তাঁর ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা হল না, এবং আশীষ লাহিড়ী যেমন বলেছেন, তাঁর অভিজ্ঞতাবাদে রয়ে গেল দুরারোগ্য গোঁজামিলের বীজ।

এখানে আমরা প্রাসঙ্গিক একটি কথা যোগ করতে চাইব। এদেশে শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ যখন ক্ষমতাবানদের দর্শন, তখন চিকিৎসকদের সমাজে একঘরে হতে হয়েছিল এবং তার অন্তত একটি কারণ ছিল এই যে চিকিৎসকরা 'বস্তু মিথ্যা চেতনাই একমাত্র সত্য', এমন কথাটি বলতে পারেন নি, কেননা সেকথাটি বলতে গেলে তাঁদের 'চিকিৎসা ব্যাপারটিই ভুয়ো খোয়াব' এমন ঘোষণা করতে হত। তাই চরক ইত্যাদি শুধুমাত্র ভারত তথা পৃথিবীর প্রথম চিকিৎসকগোষ্ঠীর অন্যতমই নন তাঁরা প্রথম বস্তুবাদী দর্শনেরও অন্যতম প্রণেতা। তাই আদি-বিজ্ঞানী হিসেবে তথা চিকিৎসক হিসেবে দর্শনশাস্ত্র তাঁদের চর্চার এক বাধ্যতামূলক বিষয় ছিল, যদিও সে চর্চা তাঁরা সবসময়ে জেনেশুনে করেছিলেন তা হয়তো নয়।

উল্টোদিকে, পাশ্চাত্যে অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনকে ভাববাদে, বা বলা যায় প্রায় বৈদান্তিক শঙ্করাচার্যের মত মায়াবাদে, পৌঁছে দিলেন বিশপ বার্কলে, এবং সেকাজে তিনি বিজ্ঞানেরই জ্ঞানভাণ্ডারকে অতি সুচারুরূপে কাজে লাগালেন। লক যে বলেছিলেন আমরা কোনো জিনিসকে প্রকৃতভাবে জানি না, কেননা আমাদের মনের মধ্যে জিনিসটির একটি ছায়া পড়ে, আমাদের জ্ঞান ওই ছায়াটুকুতেই সীমাবদ্ধ— শ্রীলাহিড়ি দেখাচ্ছেন বার্কলে সেই বক্তব্যকে তাঁর যুক্তিসঙ্গত পরিণতির দিকে নিয়ে গেলেন। বললেন, আমাদের জ্ঞান সত্যিই আমাদের চৈতন্যে যে অভিজ্ঞতা হয় তাতেই সীমাবদ্ধ, এর বাইরে বস্তুজগত আছে কিনা সেটা আমরা বলতেই পারিনা। চরম ভাববাদ বলতে যা বোঝায় একেবারে তাই আর কী। সাধে কি আর বিদ্যাসাগর মশাই এদেশের বিদ্যালয়ের বার্কলির দর্শন পড়ানোর প্রচেষ্টা হলে সেটাকে প্রাণপণে রুখে দিয়েছিলেন।

আশীষ লাহিড়ি পিটার মেডাওয়ারের একটি লেখা অনুবাদ করেছেন। নোবেলজয়ী এই প্রাণীবিজ্ঞানী 'ঈশ্বর আছেন কি নেই, সেই প্রশ্ন' তুলেছেন। এই বইতেই আশীষবাবু তাঁর লেখা অন্য এক প্রবন্ধে 'ভগৎ সিংহ লড়াকু নিরীশ্বরবাদী'— ঠিক সেই প্রশ্নটিই তুলেছেন, এবং এটি মোটেই সমাপতন নয় যে মেডাওয়ার ও ভগৎ সিংহ মোটের ওপর একই উত্তরে গিয়ে পৌঁছচ্ছেন— তাঁরা নিরীশ্বরবাদী, কেননা ঈশ্বরে বিশ্বাস করা তাঁদের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার বিরোধী। এবং শুধু সুখ— শান্তির দিনেই নয়, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও ঈশ্বর আছেন এমনটা তাঁরা ভাবতে পারেননি।

রাজশেখর বসুর গীতাভাষ্য নিয়ে একটি প্রবন্ধ, 'নিয়তি' কথাটির আদি অর্থ ও তার বিবর্তন নিয়ে একটি প্রবন্ধ, ও কয়েকটি বইয়ের সমালোচনা নিয়ে আরেকটি প্রবন্ধ লেখক বর্তমানের সংকলনের মধ্যে রেখেছেন— এগুলির আলোচনায় যাবার সুযোগ এ-পরিসরে নেই। আশীষবাবুর প্রিয়তম বিষয় রবীন্দ্রনাথ, তাঁকে নিয়ে যা লিখেছেন তার অনেক কথা আমাদের ভাবায়। রবীন্দ্রনাথ একদিকে ভাববাদী, উপনিষদের নিবিষ্ট পাঠক, অথচ গীতা যখন ভাববাদের সোপান বেয়ে 'আমাদের সত্যিকারের কোনো দৈহিক অস্তিত্ব নেই, আত্মাকে মারা যায় না, তাই যুদ্ধে মানুষ মারলে দোষ নেই' এ যুক্তিকে হাজির করে তখন তাকে প্রত্যাখ্যান না করে থাকতে পারেন না।

ভাববাদী রবীন্দ্রনাথ মনে করেন আমাদের মনই হল বাইরের বস্তুজগতের প্রকৃত স্রষ্টা, কিন্তু বিভিন্ন মনের বিভিন্ন আয়নার যে বস্তুজগত ধরা পড়ে তাদের মধ্যে যে এক গভীর সাযুজ্য রয়েছে সেটা আকস্মিক নয়, এবং সেটাই মন ব্যাপারটিকে শরীরে

আপাত-আবদ্ধ রেখেও তাকে এক জগদ্ব্যাপী মাত্রা দিয়েছে। মনের আয়নায় ধরা পড়া জগত বিজ্ঞানের খণ্ড-খণ্ড করে দেখা জগতের চাইতে আলাদা তাই নয়, সে জগত বিজ্ঞানের জগতের চাইতে সম্পূর্ণতরও বটে, নইলে এক মানুষের সৃষ্টি সঙ্গীত-শিল্প বা গণিতের বিমূর্ত সত্য অন্য মানুষের মনে অধরাই থেকে যেত। এ রহস্য, রবিঠাকুর বলছেন, বিজ্ঞানের করায়ত্ত নয়, ''সেদিক দিয়েই তাঁর (ব্রহ্মের) প্রকাশ।''

আশীষবাবু অবশ্য বলছেন মনে-মনে যে যোগ, যাতে এক মানুষের মনের আয়নায় ধরা পড়া জগত অন্য মানুষের জগতের সঙ্গে অনায়াস ভাববিনিময় করতে পারে, তার রহস্য লুকিয়ে আছে অন্যত্র। মন গড়ে উঠেছে মানুষের মস্তিষ্কের বিবর্তনের পথ ধরে, যেখানে মানুষ গোষ্ঠী হিসেবে সমাজ হিসেবে বেঁচে থাকার প্রক্রিয়ায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে। এক মানুষের চিন্তাকে অন্য মানুষের মনে সঞ্চারিত করতে সক্ষম নয় এমন কোনো মন ডারউইনীয় বিবর্তনে টিকে থাকতেই পারত না। কিন্তু মনের কার্যপ্রণালী এখনও আমাদের কাছে অধরা, সেকথাটিও আশীষবাবুর স্মৃতি ও স্নায়ু নিয়ে স্টিভেন রোজ-এর গবেষণার ওপর লেখা প্রবন্ধটিতে কিছুটা বলা হয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথের বহু কথা বহু মত নিয়ে শ্রীলাহিড়ি আলোচনা করেছেন। সেগুলি স্বক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু স্থানাভাবে এখানে আলোচনা করা গেল না।

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গেই লেখক এনেছেন সমাজবাদী বিজ্ঞানী জোসেফ নীডহ্যাম-এর কথা। নীডহ্যামের জীবন ও চিন্তা আমাদের শুধু ভাবায় না, তা আমাদের তাড়া করে। কেমন করে? তাঁর জীবনযাপনে জীবনদর্শনে তিনটি আপাত স্ববিরোধিতা ছিল— সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে পথ খুঁজে নেবার সহজ পথে নীডহ্যাম হাঁটেননি। প্রথমত, তৎকালীন বামপন্থী ব্রিটিশ তরুণ বিজ্ঞানীদের মধ্যে শতাব্দীর সমান বয়সী নীডহ্যাম-এরই কেবলমাত্র সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় আনুগত্য ছিল— অ্যাংলিকান চার্চের প্রতি। দ্বিতীয়ত, এই ধর্মীয় আনুগত্য বজায় রেখে, হয়ত বা খানিকটা তারই প্রভাবে, নীডহ্যাম তরুণ বয়স থেকেই দেশে দেশে কমিউনিস্ট সমাজ গড়ার পথে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। এবং তৃতীয়ত, ব্রিটিশ সমাজ ও সংস্কৃতিতে স্বীয় উত্তরাধিকার পরিত্যাগ না করেই তিনি চীনের সভ্যতা, এমন কি একদিকে তার তাওবাদী ও কনফুসীয় ধর্ম ও অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টির 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব'— এসব কিছুর মধ্যেই তিনি তাঁর প্রকৃত খ্রীস্টান ধর্মের সত্যসুন্দর পবিত্রকে খুঁজে পেয়েছিলেন।

নীডহ্যামের মনে হয়েছিল একটি রাজনৈতিক পথ হিসেবে কমিউনিজম তার মনোযোগ নিবদ্ধ রেখেছে বস্তুসম্পদের উৎপাদন ও বণ্টনের নৈতিকতার উপরে, কিন্তু ''মার্ক্সবাদের একটা কূট সমস্যা আছে— একদিকে তা যাবতীয় ধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে, অন্যদিকে তা অনুগামীদের উদ্দেশ্যে বৈপ্লবিক আত্মত্যাগের আহ্বান জানায়।... এই আহ্বানেব মধ্যে স্পষ্টভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে সেই শুদ্ধ পবিত্র অনির্বচনীয়, সেই কলুষহীনতার বোধ।'' নীডহ্যাম মানুষের ধর্ম, যা তাঁর একান্ত নিজস্ব খ্রীস্টীয় ধর্মেরই নামান্তর, তাকে খুঁজে পান মার্ক্সবাদের বৈপ্লবিক আত্মত্যাগের আহ্বানে। নাড়া দেয়, গভীরভাবে ভাবিয়ে তোলে তাঁর চিন্তা, বিশেষ করে এই পৃথিবীতে, যেখানে রাজনীতি আর নৈতিকতা দুই বিপরীত মেরুর বাসিন্দা, যেখানে 'ব্যবহারিক মার্ক্সবাদ' একটি লক্ষ্য-সাধনের, রাজনৈতিক ক্ষমতাদখলের, প্রকরণ মাত্র। মানবিক হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটিই কি নীডহ্যাম-কথিত শুদ্ধ-পবিত্র অনির্বচনীয়, কলুষহীনতার বোধ-এর কাছেই আবেদন রাখে না?

ভাববাদ থেকে বস্তুবাদে উত্তরণ, বা নিরীশ্বরবাদী হওয়া, বা বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতিকে জানা-বোঝাই যে মানবীয় উৎকর্ষের চরম সেটা ভাবার কোনো কারণ নেই সেটা আমরা অন্যত্রও দেখতে পাই। 'বিজ্ঞানের দুই মুখ' প্রবন্ধে আমরা দেখি লিও জিলার্ড আর এডওয়ার্ড টেলার, হাঙ্গেরী-জাত এই দুই বিজ্ঞানী ফ্যাসিস্টদের গুঁতো খেয়ে আমেরিকায় এসে কাজ করেছেন, পরমাণুবোমা বানানোর কাজে হাত লাগিয়েছেন। কিন্তু পরমাণুবোমা তৈরি হবার পরে জিলার্ড আমেরিকার শক্তিমানদের দরজায় দরজায় মাথা কুটেছেন যাতে এই দৈত্যটিকে ব্যবহার না করে ফের বোতলবন্দী করেই রাখা হয়। অন্যদিকে টেলার নিপুণহাতে মার্কিনদেশে পরমাণু-বিজ্ঞানচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা করায়ত্ত করে হাইড্রোজেন বোমা বানানোয় নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁর জীবনকে সার্থক মনে করেছেন এই কারণেই যে পৃথিবীকে বহুবার ধ্বংস করার মত অস্ত্র তিনি আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছেন।

লিও জিলার্ড আর এডওয়ার্ড টেলার—বিজ্ঞানের দুই মুখ। বিজ্ঞানের এই দুটো মুখই বাস্তব, একটা মানবিক অন্যটা দানবিক। লেখকের সঙ্গে আমরা একমত, এর মধ্যে একটাকে খুব সচেতনভাবে আমাদের বেছে নিতে হবে।

জঙ্গলমহলে চিকিৎসা-পরিষেবা দিতে গিয়ে যৌথবাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন ডাঃ সিদ্ধার্থ গুপ্ত এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রী অভিজ্ঞান সরকার। আমরা এই অগণতান্ত্রিক গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

বিতর্ক

# বিতর্কের আপাতত অবসান ঘটুক*

'অনীক' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক শ্রীরতন খাসনবিশকে এই চিঠি লিখছি। এ চিঠির নেই জবাব দেবার দায়। একটা সমালোচনা ও বিতর্ক যখন কিছু ভ্রান্তির জন্ম দেয় তখন সেটা স্বাস্থ্যহানিকর। সে কারণেই লেখা —

ক) ''রাস্তাঘাটে দেখেছি, চড়-থাপ্পড় দেবার আগে গা গরম করার জন্য সম্বোধনটা 'তুই'-এ নামে... 'তুমি' সম্বোধন করা হয়েছে আমাকে।'' শ্রীরতন খাসনবিশকে বা সম্পাদক মহাশয়কে পত্রাকারে লিখলে অবশ্যই 'আপনি' সম্বোধন করতাম। কিন্তু শ্রীরতন খাসনবিশের লেখাটি অবলম্বন করে একটি স্বতন্ত্র সংলাপধর্মী লেখার চেষ্টা করেছি। আমি তো ওই ধরনেরই লিখি। অন্তরঙ্গ সংলাপে 'তুমি' সম্বোধন শ্রেয় ভেবেছিলাম। এখন দেখছি সেটা আমার ভুল। শ্রীরতন খাসনবিশ মহাশয় 'আপনি' সম্বোধন না পেয়ে (ুণ্ণ, লেখার শু(তেই তা প্রকাশ করেছেন। ভবিষ্যতে সম্বোধনের (েত্রে সতর্ক থাকবো। এই সুযোগে একটু বলে রাখি, আমি 'পণ্ডিত' নই, 'পাঁচমূড়া পাহাড়-শ্যামলী নদীর ধার' থেকে আসা দইওয়ালার বন্ধু। অনেক কথা মনে আসে, পাল্টা যুক্তি( মনে আসে, জট ছাড়াতে পারি না... নিজের সাথে নিজের সংলাপ। আমাকে নিজের সাথে বোঝাপড়া করতে হয়। 'ওয়ালেশা মার্কা পরিবর্তনের' শঙ্কা তো আমারও। যাইহোক, শ্রীরতন খাসনবিশ মহাশয়কে উদ্দেশ্যমূলকভাবে 'তুমি' সম্বোধন করিনি।

খ) ''মিত্র মশাই ভারী জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেবার ভঙ্গিতে পোলিশ প্রতি-বিপ-বের দায় যে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি তথা পোলিশ কন্যার বাবা-মাকে নিতে হবে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করছেন। বাঁচোয়া এই যে তিনি 'বস্তুর পরিবর্তনের কারণ বস্তুর অভ্যন্তরেই থাকে'—এখান থেকে শু( করেন নি।'' প্রথমত বলি, শ্রীরতন খাসনবিশকে 'জ্ঞানগর্ভ' ভাষণ শোনাবার কথা স্বপ্নেও ভাবি না। বরং মনে করিয়ে দিতে চেয়েছি— যে পর্নোগ্রাফির পোলিশ কন্যার সাথে তার ঠাকুমা-দিদিমার বিপ-বী সংগ্রামের তুলনা করে সলিডারিটির পরিবর্তনকে তিনি বিরোধিতা করছেন, তার মধ্যবর্তী একটা প্রজন্ম ছিল, সেটা পরিবর্তনের আগের পর্ব। সেই পর্বে লাল সেলোফেনে মুড়ে পর্নোগ্রাফি বিত্রি( হত... সমাজতন্ত্র! পরিবর্তন এসে সেলোফেন সরিয়ে দিয়েছে। বিপ-বী দিদিমার নাতনিকে দেখে বেদনাহত হচ্ছেন। খেয়াল করলে দেখতে পেতেন, ওর মা-বাবাই ওকে পথ দেখিয়েছে। খেয়াল করিনি, কারণ সবই তখন লাল কাপড়ে মোড়া। শ্রীরতন খাসনবিশ আমার লেখায় কোথায় পেলেন যে তাঁকে পর্নোগ্রাফির লেখক বলে আখ্যা দিয়েছি! শ্রীরতন খাসনবিশ শু(ই করেছেন— ''আমি জীবনে অনেক কিছু নিয়ে লিখেছি। কিন্তু একটা পর্নোগ্রাফিও যে লিখেছি এবং সেই লেখাটি যে লাল সেলোফেনে মুড়ে বাজারে চালানোর চেষ্টা করেছি, এটা জানতাম না।'' শ্রীরতন খাসনবিশের কোনো লেখা সম্পর্কে কোথাও এমন কথা লেখাই হয় নি। আর উনি সেটা ধরে নিয়ে লেখা শু( করলেন!

গ) আমি নাকি 'জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেবার ভঙ্গিতে' বলেছি। আমার অমন দুঃসাহস নেই। আমাকে এই পত্রিকার বাইরে চেনেই বা কে! ''জীবনে অনেক কিছু নিয়ে লিখেছি''... ''তখন লিখেছিলাম অনীকের পাতা ভরিয়ে''... ''আমি এসপ্-্যানেডে মেট্রো চ্যানেলে প্রকাশ্যে বলেছি''... ''সেমিনারে প্রবন্ধ পাঠ করেছি, অনীকেও লিখেছি''— আমি কখনো শ্রীরতন খাসনবিশের পাণ্ডিত্য নিয়ে প্র(া তুলিনি। অধমের যেটুকু জ্ঞান সে তো আপনাদের লেখা পড়েই। আপনার পাণ্ডিত্যের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই বলছি— 'জানিস আমি স্যাণ্ডো করি' ভাবটা দয়া করে থামান। ওটা (মতার ভাষায় মানানসই— 'আমরা ২৩৫'! পণ্ডিতদের মানায় না।

ঘ) ''আমার আলোচ্য বিষয় ছিল 'কোন্ পরিবর্তন'... আমি ওয়ালেশা-মার্কা পরিবর্তন চাই না, আমি তৃণমূল-মার্কা পরিবর্তনও চাই না।'' শ্রীরতন খাসনবিশের এই মোদ্দা কথাটা প্রথম লেখাতেই স্পষ্ট ছিল... এ মত তো বহু বামপন্থীই পোষণ করেন। শ্রীরতন খাসনবিশ এরপর সিদ্ধান্ত করলেন, ''এই পচাগলা বামপন্থা নিয়েই আমি বাঁচবো।'' ঠিক এখানেই এসে পড়লো আপনার বলা তত্ত্বকথা— 'বস্তুর পরিবর্তনের কারণ বস্তুর অভ্যন্তরেই থাকে।' আপনি তৃণমূলী 'পরিবর্তন' চান না, বরং যে 'পচাগলা বামপন্থা' এই পরিবর্তন অনিবার্য করেছে তাকে নিয়ে বাঁচতে চান। যে 'পচাগলা বামপন্থা' মানুষকে বামপন্থা সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করেছে তাকে নিয়ে বাঁচতে চান আপনি। তৃণমূল-মার্কা পরিবর্তনকে আপনিই আবাহন করছেন। করেছেন। ঠিক এইখানে আপনার যুক্তি( আমার বোধগম্য হয় নি।

রতনবাবু, পরিবর্তনের যে কারণ (পচাগলা বামপন্থা), তার সাথে সঙ্গতি রেখেই পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তন এখন বিতর্কের বিষয় নয়। বাস্তব সত্য। অতএব, বিতর্কের ইতি টানা দরকার। শ্রীরতন খাসনবিশ লিখেছেন, ''আমার ধারণাও ছিল না যে, এত কু(চিকর ব্যঙ্গ কেউ করতে পারে।'' এরই সাথে তিনি 'একটি কু(চিকর চিঠির জবাব লেখার বিড়ম্বনা-র কথাও লিখেছেন। শ্রীরতন খাসনবিশের লেখার পাঠক আমি। আর সেই লেখক আমার কু(চির শিকার হয়েছেন, ভেবেই আমি ব্যথিত, দুঃখিত।

---

* *অনীক* জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১১ 'পরিবর্তন' সংখ্যায় রতন খাসনবিশের লেখার পরিপ্রে(িতে যে বিতর্ক শু( হয়েছে তাতেই নতুন সংযোজন এই লেখা/চিঠিগুলি— *সম্পাদকমণ্ডলী অনীক*

অনেক বার করে খুঁজে দেখে মনে হল 'প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির টানাপোড়েনে পড়া বুদ্ধিজীবী'— এই কথাটা শ্রীরতন খাসনবিশের কাছে 'কু(চিকর' লেগেছে। শ্রীরতন খাসনবিশের নিজের কথায় ''রাজনীতিকে ঘিরে আমার কোনো কায়েমি স্বার্থ নেই। বামফ্রন্টের কাছে কোনোদিন কিছু চাইনি, বরং দিতে গেলে 'না' বলেছি। নকশালপন্থীদের কাছেও আমার কোনোদিন কিছু পাওয়ার ছিল না।'' এমন একজন নির্মোহ মানুষের কাছে 'প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির টানাপোড়েনে' কথাটা হওয়াই 'কু(চিকর'।

তবে শ্রীরতন খাসনবিশ নিশ্চয় মানবেন, 'প্রাপ্তি' বলতে তো নগদ প্রাপ্তি-চেয়ারম্যান-ডিরেক্টর-উপদেষ্টা— এগুলি সব নয়। বৈষয়িক প্রাপ্তির বাইরে আছে নৈতিক ও আদর্শগত প্রাপ্তি। এ(ত্রে শ্রীরতন খাসনবিশ আদর্শগত দিক থেকে সিপিএমের কর্মসূচিতে নৈতিক প্রেরণা পান। দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে পার্টি যদি কোনো অঙ্গরাজ্যে সংসদীয় (মতায় আসার সুযোগ পায়, আসতে পারে। ল(্য থাকবে জনগণের আশু সমস্যাবলীর প্রশমন... বিদ্যমান সংসদীয় ব্যবস্থার অসারতা সম্পর্কে উপলব্ধি বাড়ানো... এই কর্মসূচীতে মৌলিক কোনো গলদ নেই। এটাই তো বড় আদর্শগত প্রাপ্তি শ্রীরতন খাসনবিশের। যে প্র(েন নকশালপন্থীরা অস্পষ্ট ও দিশাহীন। আপনি তো অনেক লেখালেখি করেন, দুটো-তিনটে ধন্দ দূর করলে বড়োই উপকৃত হই।

১) বিপ্-বী ঝঞ্ঝা (ুব্ধ সময়ে 'দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে সরকারে অংশ' নেওয়ার অর্থ বুঝেছিলাম— ঝড়-বাদলের রাতে শুঁড়িখানায় আশ্রয় নেওয়াটা অবিপ্-বী নয়। এখন দেখছি ৩৪ বছর দলের স্থায়ী ঠিকানা শুঁড়িখানা। শুঁড়িখানায় নেশা এতই প্রবল যে নেশার ঘোরে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গৌতম দেব দলের কেন্দ্রীয় কমিটির দলিল প্রসঙ্গে বলছেন, ''(ুদ্র ও প্রান্তিক চাষির জমি অধিগ্রহণে আপত্তির কথা বলা হলেও পশ্চিমবঙ্গে এই নীতি প্রযোজ্য নয়।'' আমি তো মোটা মাথায় বুঝি, যে রাজ্যে (মতায় নেই সেখানে চাষির জমি র(ার লড়াই হবে... পস্কো... খাম্মান... নয়ডা। পশ্চিমবঙ্গে (মতায় আমি— ঐ নীতি প্রযোজ্য নয়। আমার ব্যাখ্যাটা তৃণমূল মার্কা হলো, বিপ্-বী ব্যাখ্যা আপনি দেবেন।

২) এই ধরনের সরকার জনগণের আশু সমস্যাবলীর প্রশমন ঘটাবে। অর্থাৎ জনগণকে আপৎকালীন রিলিফ দেওয়ার কাজ করবে। বাস্তব সত্যটা হলো, আপনারই ভাষায় 'ওয়াশিংটন মার্কা উন্নয়নের ধাক্কায়' রিলিফ কর্মসূচি জনগণের দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছে। টাটা মোটরস-সেলিম-জিন্দালদের দিকে। সাউথ সিটি....নর্থ সিটি...নিউটাউন...বেদিক ভিলেজ...আইটিসি-সোনার বাংলা...আহেলী...AMRI...ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক— এ সবের সাথে জনগণের আশু সমস্যার সম্পর্ক কোথায়?

৩) বিধানসভা নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণ কি 'ব্যবস্থার অসারত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি' প্রমাণ করলো? আরো কড়া কথা হলো, নির্বাচনে পরাজিত সিপিএম নেতাদের শরীরী ভাষা কী প্রমাণ করছে? জনগণ না হলেও অন্তত নেতারা ব্যবস্থার অসারত্ব সম্পর্কে সচেতন? যে সিপিএম টাটার জন্য জমি কেড়ে নেওয়ায় কৃষকের উপর ঔপনিবেশিক ১৮৯৪-র অধিগ্রহণ আইন প্রয়োগ করলো, সেই সিপিএম কৃষকের জমি ফেরত দেওয়ার অর্ডিন্যান্সের বিরোধিতা করলো! ভাস্যিস বিপ্-ব হয়নি, হলে তো অর্ডিন্যান্স করে দেশি-বিদেশি পুঁজি বাজেয়াপ্ত করতে হতো। ৩৪ বছরের সহবাস, এখন তাই বুর্জোয়া দলের চেয়েও সংসদীয় ব্যবস্থায় আসক্তি(। রাজার চেয়েও রাজকীয়। গত পাঁচ বছর ধরে বলে চলল জমি ফিরিয়ে দেওয়ার আইন নেই। হরেকৃষ(কোঙার হলে বলতেন, আমি মন্ত্রী, সংবিধানের নামে শপথ নিয়েছি, আইন মেনে চলবো। আপনারা গরীব কৃষকরা যারা জমি হারিয়েছেন, তারা তো সংবিধানের শপথ নেন নি। তারা নিজের হক নিজেরা বুঝে নিন। কৃষককে ৪০০ একর জমি ফেরতের প্র(েন কত আইনের প্র(েন, আর টাটার জমি দখল করতে বৎসরাধিক কাল ১৪৪ ধারা! আপনি কী বলবেন?

৪) একটি অঙ্গরাজ্যে (মতাসীন বিপ্-বী সরকার সারা দেশে দৃষ্টান্ত তৈরি করবে। বিপ্-বী ধারণা-চেতনা-চিন্তা সম্প্রসারিত হবে। সংসদীয় রাজনীতির মাপকাঠিতে কাজটা কতটা এগোল? বিপ্-ব বাদ দিন, নিজের মুরোদে সিপিএম আসামে ৮-১২টা আসন পেতো। বিহার-অন্ধ্রে এখন বিধানসভা আসন পাওয়া স্বর্গীয় প্রাপ্তি( অথচ সত্তর দশকেও বিহার-অন্ধ্র-মহারাষ্ট্রে-পাঞ্জাবে এ হাল ছিল না। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে (মতালাভ... রাজ্যে রাজ্যে রামা রাও-হেগড়ে-ফা(ক আবদুল্লা-মহান্তি-লালু-মুলায়ম (মতার সাথে গাঁটছড়া বাঁধা। সংগঠনের দুর্বল হওয়া, কিন্তু উপরিতলে শক্তি(শালী হওয়া( জাতীয় রাজনীতিতে সুরজিৎ-জ্যোতিবসু-প্রকাশ-সীতারামের রমরমা। সাংগঠনিক স্তরে বিলীয়মান প্রায়। বিপ্-বী বাদ দিন, সংসদীয় ব্যবস্থাতেও এ দল চলবে কি?

৫) শ্রীরতন খাসনবিশ এই দলের কর্মসূচিতে ভারসাম্য দেখলেন, আর আমি দেখছি টালমাটাল দশা। ১৩.৬.২০১১ সংবাদে প্রকাশ, সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটি অধিবেশনের পর হায়দ্রাবাদে প্রকাশ কারাত বলেছেন, ''সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের ভুলের চড়া মাশুল আমাদের দিতে হয়েছে।'' এরপর ১৬.৬.২০১১ সংবাদে প্রকাশ, কলকাতায় মৌলালী যুব কেন্দ্রে ছাত্রদের সভায় পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য গৌতম দেব বলেন— ''এমন ভাবার কোনো কারণ নেই যে, সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের জন্য আমাদের হার হয়েছে। দলের কেন্দ্রীয় কমিটিও তা মনে করে না।'' দুটো পায়ের মধ্যেই ভারসাম্য নেই... টালমাটাল অবস্থা... কোথায় ভারসাম্য? একে পচাগলা বামপন্থাও বলা যায় না, সিপিএমের কঙ্কাল। তখনই প্র(েন জাগে বৈষয়িক প্রাপ্তি নয়— পদ বা (মতাও নয়, আদর্শ বলেও তো কিছু নেই...তা না হলে বুদ্ধ এখনও ইউপিএ ছাড়া...কংগ্রেস তৃণমূল জোট হওয়া...ইত্যাদি। পরমাণু চুক্তি(টা কোনো বিষয় না! তাহলে কঙ্কাল আঁকড়ে কেন থাকবেন!

*অনীক* পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীরতন খাসনবিশের উদ্দেশে লেখা চিঠিটা এখানেই শেষ। বিতর্ক শেষ। পরিবর্তন এসেছে। এবার সে নিজেই সব উত্তর দেবে। আশঙ্কা দূর করবে, অথবা শঙ্কা বাড়াবে। সমস্যা হলো কথা তো থামে না। শেষ একটাই প্র(্ন!

শ্রীরতন খাসনবিশ মহাশয় আজকের পরিবর্তনে আপনি ফিকি-র অমিত মিত্রকে দেখে শঙ্কিত। আমিও কম শঙ্কিত নই। কিন্তু শঙ্কিত হয়ে আপনি আঁকড়ে ধরেন পচাগলা বামপন্থা, যার পৃষ্ঠপোষক রতন টাটা স্বয়ং। যিনি এ রাজ্যে বাম সরকারের প( পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন লাখ টাকা খরচ করে। শ্রীরতন খাসনবিশ, আপনার শঙ্কা জাগে না কেন?

**মানবিকা মিত্র**

---

# প্রসঙ্গ পরিবর্তন

আজকের পশ্চিমবাংলা পরিবর্তন ও পরিবর্তন-বিমুখ তথা স্থিতিপন্থীতে ভাগ হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে 'পরিবর্তন' এসেছে। নতুন করে অনেক হয়ত স্থিতিপন্থীতে রূপান্তরিত হয়েছেন বা হবার মুখে। যেমন দেখেছিলাম সাতাত্তরে। আমার এক সহকর্মী, তার হৃদয় ভেদ করলে তিনটে রঙ দেখা যাবে বলে যে দাবি করত, তার কাছে পরিবর্তন ছিল রাষ্ট্র-বিরোধী, ধর্ম-বিরোধী। নির্বাচনের ফল বেরোবার পর তার হৃদয়ে রক্তি(ম ঝান্ডা উড়তে শু( করেছিল। আজ সেই হৃদয়ে নিশ্চয়-ই ঘাসফুল ফুটেছে।

পরিবর্তনের ধর্মই বোধহয় এটা। বিশুদ্ধ পরিবর্তন বলে কিছু হয় না, তা সঙ্গে অনেক জঞ্জাল নিয়ে আসে বা জঞ্জাল ঢুকে পড়ে। এর ফলে অনেক সময় সত্যিকারের পরিবর্তনের কাlbWত ফল না পেয়ে সত্যিকারের পরিবর্তনপন্থীরা নিরাশ হন। তা-ও আবার তারা পরিবর্তন চান, তার জন্য লড়াই চালিয়ে যান। অনেকে আবার এই জঞ্জাল-মিশ্রিত পরিবর্তনে ভয়ংকর কিছু ঘটতে পারে আশংকায়— যতই খারাপ-ই থাকি না কেন, এই তো বেশ— ভেবে সান্ত্বনা পান, নিজে পরিবর্তন-বিমুখ স্থিতিপন্থী হয়ে যান। অন্যদের কাউকে কাউকে অভিজ্ঞতাবাদী, আবার কাউকে ধান্দাবাজ বলেন, 'পচা-গলা'র মধ্যেও প্রগতির উপাদান খোঁজেন। আমরা কিন্তু পরিবর্তন চাই, অবিরত পরিবর্তন— যত( ণ না কাlbWত পরিবর্তন আসে। আমরা যেমন আগে থেকেই জানতাম যে 'সাতাত্তরে' কাlbWত পরিবর্তন আসবে না, কারণ স্বৈরাচারের বি(দ্ধে লড়াই করতে গিয়ে তখন কিছু জঞ্জাল সঙ্গী হয়েছিল। তাই বলে পরিবর্তন কাম্য নয়, স্থবিরতাই কাম্য— এমন কথা মনে করে লড়াই বন্ধ করে দেওয়ার উপদেশ মেনে নেওয়া হয়নি। আজ সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, লালগড়ে গণ-অভ্যুত্থান ঘটেছে। মানুষ পরিবর্তন আনতে বদ্ধপরিকর। নন্দীগ্রামে তারা জয় পেয়েছে। সিঙ্গুরে জয়ের মুখে। শাসকগোষ্ঠী ঘোষণা করেছিল যে তারা (মতায় এসে মানুষের জয় ছিনিয়ে নেবে। তারা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে তাদের বিজয় পতাকা ওড়াবে। অর্থাৎ পরিবর্তন না হলে, শাসকদলের প্রত্যাবর্তন হলে জল-জমি-জঙ্গলের অধিকারের আন্দোলন যে পদদলিত হতো সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। শুধু তাই নয়, লুট, খুন, ধর্ষণের মতো অপরাধগুলোও বৈধতা পেয়ে যেত।

অবশ্য নির্বাচনের আগে থেকে অনেক বামপন্থী-বন্ধু বলে আসছেন— বামফ্রন্ট প্রগতিশীল, তাই পচা-গলা হলেও তাকে সমর্থন করতে হবে। অথচ এ রাজ্যেই প্রমাণ হয়ে গেছে যে, 'বাম' নামাবলী গায়ে দিয়ে একটা সংশোধনবাদী দল (মতায় গিয়ে কায়েমি স্বার্থে দলকে ব্যবহার করলে সেটা কী প্রচন্ড ভয়ংকর হয়ে ওঠে, তার মধ্যে আর 'বাম' বলে কিছু থাকে না। এটা আজ আর শুধুমাত্র তত্ত্বকথা নয়— নির্মম বাস্তব, আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা। এই সত্যকে অস্বীকার করে বন্ধুরা কেউ কেউ শিল্পায়নে কিছু কৌশলগত ভুল হয়ে গেছে, তাই তাকে শুধরে নিলেই চলবে গোছের যুক্তি( দেখিয়ে এর নীতিগত দিকটা উপে(া করেন। আজকের দিনে বি(্বায়নের ফর্মুলামাফিক শিল্পায়ন যে নেহাত একটা-দুটো শিল্প স্থাপন নয়, সেটা প্রমাণিত। দুনিয়া জুড়ে বহুজাতিক সংস্থাগুলি মুনাফার তাগিদে এমন সব শিল্প স্থাপন করে, যা সামাজিক ন্যায়বিচার, প্রাকৃতিক ভারসাম্য, দেশের সার্বভৌমত্ব, কোনোটার তোয়াক্কা করে না— এই সত্যটাকেই অস্বীকার করা হয়। সুতরাং এটা নেহাত কৌশলগত ভুল নয়, এটা নীতিগত বি(্বাসঘাতকতা। এর বি(দ্ধে সাধারণ মানুষের লড়াইটা সমর্থন করাই নীতিগত বাধ্যবাধকতা। বরং লড়াইয়ের পথে কোন ভুল থাকলে লড়াইটা চালু রেখে-ই তা শুধরে নিতে হয়, তার সমালোচনা করতে হয়। ভুলকে বড়ো করে দেখিয়ে শাসকশ্রেণীর হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়াই হলো বি(্বাসঘাতকতা। আর পরিবর্তনের পর নতুন (মতা নতুন উদ্যম রাষ্ট্রশক্তি( এক-ই পন্থায় ব্যবহার করলে তার বি(দ্ধেও লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা জানি আমাদের কাlbWত পরিবর্তন কোনো সূচিকর্ম নয়, তা এত মসৃণও নয়। কিন্তু আমরা যখন নিধিরাম সর্দার তখন পরিবর্তন ঘটবে না, তা ইতিহাস বলে না।

সেই সব বামপন্থী-বন্ধুই আবার 'সিআইএ এই পরিবর্তনে মদত দিতে পারে'— এই ভয়ে পরিবর্তন কাম্য নয় বলে মনে করছেন। এর জন্য তারা রাশিয়া চীন বা পোল্যান্ডের প্রসঙ্গ আনছেন। অথচ ভারতেই 'সাতাত্তরে' যে পরিবর্তন ঘটেছিল, সেটাও বিশুদ্ধ ছিল না, তাতে দ(িণপন্থা ও সাম্প্রদায়িকতার ভেজাল ছিল। তবুও সেই পরিবর্তন কাম্য ছিল। আমাদের তখন

অ্যাজেন্ডা ছিল স্বৈরতন্ত্রের অবসান, বন্দীমুক্তি, ভূমিসংস্কার। এই রাজ্যে বামফ্রন্ট জমানাতেই বন্দীমুক্তিতে অন্তত সাময়িকভাবে প্রায় একশো ভাগ আর ভূমিসংস্কারে আংশিক সাফল্য পাওয়া গেছে। কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকার-ই পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে তার নখ দাঁত ধারালো করে তুলেছে, রাষ্ট্রশক্তিকে গণআন্দোলন দমনে ব্যবহার করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। 'বাম' নামাবলীর স্বরূপ উপলব্ধি করতে না পারায় অযৌক্তিক মোহের কারণ থাকায় মরিচঝাঁপির মতো ঘটনার প্রতিও উদাসীনতা দেখাবার অপরাধের বোঝা এখনও আমরা বয়ে চলেছি। 'সিআইএ-এর চক্রান্ত'-র প্রচার আমাদের স্থবির করে রেখেছে। কিন্তু নতুন আর্থিক নীতি অনুসরণ করে বামফ্রন্ট সরকার 'পুঁজিবাদ নির্মাণ'-এর স্লোগান তুলে ক্রমে ক্রমে *সেজ* গঠন, কেমিকেল হাব তৈরি বা সিঙ্গুরে টাটার একচেটিয়া পুঁজি টাটার শিল্প গড়ে তোলার তাগিদে জমি থেকে গরিব মানুষকে উচ্ছেদে রাষ্ট্র ও দলকে লাগালে মানুষ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। পরিণতিতে বহুজাতিক সংস্থার মদতে রাষ্ট্র আরও হিংস্র হয়ে ওঠে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আন্দোলন জয়যুক্ত হয়। এই প্রক্রিয়াতেই সরকার বদলের দাবি উঠেছিল। নতুন কেউ এসে কী করবে তা আর প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল না। এই অবস্থায় বামফ্রন্ট সরকার যখন ঘোষণা করেছিল যে, তারা কিছু ভুল করলেও শিল্পায়নের নীতিতে কোনো ভুল করেনি, তখন মানুষের এদের ওপর আর কোনো আস্থা রাখতে পারেনি। এর আরো কারণ এই যে এরাই কাগজে কলমে হলেও সর্বভারতীয় স্তরে নয়া আর্থিক নীতির বিরোধিতা করেছিল। এদের এই দ্বিচারিতা ধরা পড়ে যায়। এই অবস্থায় রাজনীতি নিয়ে এদের আর বলার অবকাশ ছিল না। তাই বিরোধী নেতৃত্বকে গালাগালি দেওয়াটাই এদের প্রচারের মূল বিষয় হয়ে ওঠে। শুরু হয় 'সিআইএর চক্রান্ত'-এর তত্ত্ব ফেরি করা এবং বিরোধী নেত্রীকে ইঙ্গিতে 'সিআইএর দালাল' বলার প্রতিযোগিতা।

সিআইএ-এর দালাল তত্ত্ব দাঁড় করাবার জন্য পোল্যান্ডের সলিডারিটি আন্দোলনের প্রসঙ্গ আনা হয়। আমরা অতীতেও দেখেছি ভারতে কমিউনিস্টরা যখনই সমস্যায় পড়ে তার সমাধান করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়, তখনই সিআইএ-র তত্ত্ব আমদানি করা হয়। এটা ঘটনা যে, তখন বোঝা না গেলেও পরবর্তীকালে ধরা পড়েছিল, পোলান্ডে সরকরের বিরুদ্ধে সলিডারিটি আন্দোলন সিআইএ-র প্ররোচনায় সংগঠিত হয়েছিল, সলিডারিটি-র নেতা ওয়ালেশাকে সিআইএ অর্থসাহায্য থেকে শুরু করে সব রকমের সাহায্য দিতো। কেউ কেউ সেজন্য পরিবর্তনের কথা শুনলেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন, ওয়েলেশা-র দৃষ্টান্ত তাঁদের তাড়া করে বেড়ায়, পোল্যান্ডের পরিণতি তাঁদের উদ্বিগ্ন করে তোলে। তারা তাই আতঙ্কিত হন, মমতার নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে 'পরিবর্তন' সে রকমটাই ঘটাবে। আসলে এটা তাঁরা শিখেছেন সিপিএম নেতাদের কাছ থেকেই। তাঁরাও বলেন পোল্যান্ডের মতো এখানেও সিআইএ 'পরিবর্তন'-এর জন্য টাকা ঢালছে। বিপদে পড়লেই দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলোকে আলোচনায় না এনে বিচ্ছিন্নভাবে সিআইএর ভূত তাদের মূল আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। এই ভূতের ভয়েই পরিবর্তনের দরকার নেই বলে প্রচার করে বেড়ান স্থিতিপন্থীরা। এরা অবশ্য কেন পরিবর্তন হবে না, বা হওয়া উচিত নয়— তা নিয়েই মূলত সোচ্চার, বামফ্রন্টের প্রত্যাবর্তনের পক্ষে 'সদর্থক' কী কী উপাদান আছে, তা নিয়ে আলোচনা করার দরকার এরা অনুভব করেন না। বামফ্রন্ট 'পচা-গলা' বলেই বোধহয় উল্লেখ করার মতো 'সদর্থক' উপাদান খুঁজে পাওয়াটা অসুবিধেকর হয়ে পড়ে। অর্থাৎ পরিবর্তনপন্থীরা যেমন বামদের অপশাসন ও নিপীড়নমূলক কাজকে তাদের সরে যাওয়ার তথা পরিবর্তন-এর যথেষ্ট শর্ত বলে মনে করেছেন, তেমনি স্থিতিপন্থীরা পরিবর্তনে কী ভয়ঙ্কর অবস্থা হতে পারে শুধু তার ভয় দেখিয়েই স্থিতি চাইছেন। যদিও সেই স্থিতাবস্থাতেই ঘটে যায় সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড়-সূচপুর। বোধহয় স্থিতিপন্থীদের কাছে এগুলো ভয়ংকরের পর্যায় পড়ে না। বিশ্বায়নের অর্থনীতি চালু থাকলেও, 'বাম' আমলে সিআইএ পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে ভয় পায়, মমতার জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হয়— এটাই তাঁদের অভিমত। সিআইএ-সূচিত পোল্যান্ডের 'মুক্ত' গণতন্ত্রে পরিবর্তী প্রজন্মের যুবতীরা অনেকেই পেটের দায়ে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। ঠিক তেমনি এই রাজ্যে 'পরিবর্তন' সিআইএ-র ঔরসে সংসদীয় গণতন্ত্রের গর্ভে পর্নোকন্যার জন্ম দিতে সাহায্য করবে— এই ভয়েই এরা প্রত্যাবর্তনের পক্ষে দাঁড়ান। এই যুক্তিতে ও ভয়ে তো তাহলে কোনো আন্দোলনই করা যায় না, এমনকি মার্কসবাদ অনুশীলনেও আপত্তি করা উচিত। কারণ বাস্তবত সব গণ-আন্দোলনেই, বা মার্কসবাদ অনুশীলনেও সব সময়ে মুখোশের আড়ালে সিআইএ ঢুকে পড়ার চক্রান্ত চালায়, তারা ঢুকবে না এমনটা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না। তাই বলে কি সেই ভয়ে গণ-আন্দোলন বা মার্কসবাদ অনুশীলনও পরিহার করতে হবে। তাছাড়া পর্নোকন্যা জন্মের পথ বন্ধ করতেই যদি তাঁরা 'পচা-গলা' বামফ্রন্টকে সমর্থন করতে বাধ্য হয়ে থাকেন, তাহলে কিন্তু ধরে নেওয়া হচ্ছে যে বামফ্রন্টের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে চাকুরির অবাধ সুযোগ ছিল, মেয়েদের তার ফলে পর্নোকন্যা হবার দরকার ছিল না। অথচ বাস্তব তথ্য জানাচ্ছে, এই রাজ্য থেকেই সারা দেশে মেয়ে পাচার হয়েছে সমগ্র বামফ্রন্ট জমানা জুড়ে। এখানে আজ ঘরের দরজা খুললেই পর্নোকন্যার সাক্ষাত মেলে।

আসলে স্থিতিপন্থীরা দ্বন্দ্বতত্ত্বের মূল সূত্রটাই অস্বীকার করতে চাইছেন। কেননা কোনো বস্তুর বিকাশের শর্ত নিহিত থাকে

বস্তুটার ভেতরে, বাইরের বিষয় তাকে সাহায্য করে মাত্র। সংশোধনবাদের শেষ পরিণতিও তার নিজের ভেতরের কারণেই ঘটেছিল। পোল্যান্ডের সংসদীয় বা পশ্চিমী গণতন্ত্রের আবির্ভাবও ঘটেছিল সংশোধনবাদের নিজের সংকটের পরিণতিতে। সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা আন্দোলনই তৈরি করে দিয়েছিল পরিবর্তনের শর্ত। এই বিষয়টাকে উপে(া করে সিআইএর চত্র(ান্তকে মূল বিষয় হিসেবে নিয়ে এলে সংশোধনবাদকে আড়াল করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে বি(ায়নের নক্সা অনুসরণ করে শিল্পায়নের নামে দেশি-বিদেশি বহুজাতিক সংস্থার কর্তৃত্ব স্থাপন করার প্রত্রি(য়ায় মানুষের জীবনজীবিকা বিপন্ন করলে তার বি(দ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠবেই। মুখে কেন্দ্রের অনুসৃত বি(ায়নের পথের বিরোধিতা করেও সেই সাম্রাজ্যবাদ-প্রণোদিত পথে গেলে, মূলত সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামালে পরিবর্তনের ঝড় উঠবেই। তাকে কাজে লাগিয়ে আন্দোলনকে মৌলিক পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যাওয়ার সংগঠন, কর্মসূচি বা হিম্মত বিপ্-বীদের না থাকলে মমতা বা অন্য কারো নেতৃত্বে সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যেই পরিবর্তনের দাবি উঠতে বাধ্য। এটা আমার-আপনার ইচ্ছা-নিরপে( । এই প্রত্রি(য়ায় পরিবর্তনের শর্ত তৈরি হলে সেটা সিআইএর প্ররোচনা হয়ে যায় কী করে? আর এতেই সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে পর্নোকন্যা জন্ম হওয়া শু( হয়? অথচ আশ্চর্য, আগেই বলেছি, 'বাম' আমলেই পশ্চিমবঙ্গের মেয়ে চালানে প্রথম হবার 'কৃতিত্ব' স্থিতিপন্থীদের নজর এড়িয়ে যায়।

সিআইএর মদতে সংসদীয় গণতন্ত্রে পর্নোকন্যাদের বাড়বাড়ন্ত হয়— এই যুক্তি( দাঁড় করাবার জন্য পোল্যান্ডের ঘটনার প্রবর্তন করার দরকার হলো কেন বোঝা গেল না। ভারতে সংসদীয় ব্যবস্থা বর্তমান, নতুন শিল্পনীতির সূচনাকাল থেকেই বহুজাতিক সংস্থার রমরমা। সেই বহুজাতিক সংস্থার অর্থ সাহায্য বিভিন্ন ধরনের সংস্থার মাধ্যমে-ই যেখানে সিআইএ কাজ করে। বি(ায়নের সঙ্গে সঙ্গে এনজিও-র বাড়বাড়ন্ত এই বার্তাই বহন করে বলে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে বোধহয় সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের অভিজ্ঞতা প্রাসঙ্গিক হবে। বিপ্-বের পরও সমাজতন্ত্র গঠন প্রত্রি(য়াকালে কমিউনিস্ট দলের মধ্যে ঘাপটি-মেরে-থাকা পুঁজিবাদী পথের যাত্রীদের সঙ্গে লড়াই করে যেতে হয়। সংশোধনবাদীদের গর্ভে তখনও একদিকে যেমন পর্নোকন্যা-পুত্রের জন্ম হয় তেমনি সিআইএর অনুচরদের প্রবেশ ঘটে। লেনিন-স্তালিন-মাও সবাইকে সংশোধনবাদের বি(দ্ধে লড়তে হয়েছে। তা সত্ত্বেও ত্রু(শ্চেভের নেতৃত্বে সোভিয়েতে এবং তেংসিয়াওপিং-এর নেতৃত্বে চীনে সংশোধনবাদীরা (মতা দখল করেছে। সোভিয়েত ভেঙে গিয়ে কার্যত পশ্চিমি ঢং-এর রাজত্ব কায়েম হয়েছে। সেখানে আজ অবাধে পর্নোকন্যা যেমন জন্মাচ্ছে তেমনি সিআইএর-ও অবাধ প্রবেশ। চীন বি(ায়নের পথে এগিয়ে চলে গর্বিত। তবে কি বলতে হবে ঃ লেনিন-মাওরা সংশোধনবাদের বি(দ্ধে লড়াই করে ভুল করেছিলেন? ত্রু(শ্চেভ-ব্রেজনেভ-তেংশিয়াওপিং-দের অমরত্বের জন্য বিপ্-বীদের লড়াই করতে হতো? কার জন্য লড়বেন? সংশোধনবাদের গর্ভ যেখানে পর্নোকন্যার জন্ম হয়! বরং স্বীকার করতে হয় যে তাঁরা সেই সঠিক লড়াইয়ে পরাস্ত হয়েছিলেন। আর সংশোধনবাদের প( লড়াই করেও কিছু হতো না, কারণ সংশোধনবাদ একচেটিয়া পুঁজিবাদকে-ই মদত দেয়। সুতরাং ভবিষ্যতে এই লড়াইকে আরও তীব্র করে তুলতে হবে।

সংশোধনবাদীরা (মতায় বসলে কতটা (মতামদমত্ত হয়ে উঠতে পারে তার কিছু ছবি আমরা পশ্চিমবঙ্গে 'বাম' আমলে দেখেছি। সংসদীয় গণতন্ত্রের কথা বলে মূলত পুঁজিবাদী স্বার্থ র(া করার জন্য দলকে রাষ্ট্রের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে সন্ত্রাস নামায়। সেইজন্যই এরা টানা পঁয়ত্রিশ বছর থাকতে পারে টাটাদের মত শিল্পপতিদের আশীর্বাদ নিয়ে। আজ মানুষের বি(োভে সেই গণতন্ত্রের মুখোশটা খুলে গেছে। তাই এই বদলে মানুষ উৎসাহী, প্রকৃত জনস্বার্থবাহী বিকল্প যতদিন না পাওয়া যায় ততদিন এটা চলবে। সে-কারণেই স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নামে পরো( সাধারণ মানুষের আন্দোলনকে দমন করার প( মত দেওয়া চলে না। রাষ্ট্র থাকলে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কার স্বার্থে? জীবনজীবিকা থেকে সাধারণ মানুষকে উচ্ছেদ করে আজকের বি(ায়নের নক্সা ধরে শিল্পায়নের নামে দেশি-বিদেশি বহুজাতিক সংস্থার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করলে জনগণের অভ্যুত্থান ঘটবেই। এটা আজ সারা পৃথিবীতে ঘটে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ তার ব্যতিত্র(ম হতে পারে না। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ব্যাপক জন-জাগরণের পটভূমিকায় সামিল হন বিভিন্ন স্তরের মানুষ। বিভিন্ন দল ঐক্যবদ্ধ হয় বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে। মমতাও সংসদীয় গণতন্ত্রের দাবিতে আন্দোলনে শুধু অংশগ্রহণ করেন নি, তাতে তাঁর নেতৃত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভিন্ন প্রে(াপটে হলেও সাতাত্তর সালেও এটা ঘটেছিল। তখন এই বামপন্থীদের সাম্প্রদায়িক জনসংঘের ও সংগঠন কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়তে হয়েছিল— যাকে এই তথাকথিত বামপন্থীরা এখনও 'ঐতিহাসিক' বলে মনে করেন। তখনও আন্দোলনের ডাক ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র ফেরানোর। তবে তখনও ভয় ছিল যে সাম্প্রদায়িক শক্তি( মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। তৎসত্ত্বেও আন্দোলন হয়েছে। স্বৈরাচারী ইন্দিরা গান্ধীর পতন হয়। বিজেপি থাকা সত্ত্বেও সরকারকে সমর্থন করা হয়েছে। নিশ্চয়-ই সিআইএ তখন বসে থাকেনি। সাম্প্রদায়িক শক্তি( মাটি পেয়েছে। পরে বাবরি মসজিদ ঘটেছে। কিন্তু তার আশংকায় 'সাতাত্তরের আন্দোলন' পেছিয়ে থাকেনি।

'সাতাত্তরের' আন্দোলনের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে সংসদীয় গণতন্ত্রের জয় হলো। কিন্তু তবু সিআইএ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে

পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে পারল না, পর্নোকন্যার জন্ম হলো না, কিন্তু তার এতদিন পরে আজকে মমতার ( মতা লাভ সেই পর্নোকন্যা জন্মের শর্ত তৈরি করেছে বলে স্থিতিপন্থীরা উৎকণ্ঠিত। আজ পশ্চিমবঙ্গে যে আন্দোলনে প্রকৃত বামপন্থীদের সামিল হয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা, এবং সেটা না পারার জন্য যেখানে আত্মসমালোচনা করার কথা, সেখানে মমতাকে টেনে, তাকে সিআইএ-র এজেন্ট আখ্যা দিয়ে সমগ্র লড়াইটাকেই কালিমালিপ্ত করার চেষ্টাই, শেষ বিচারে, ধরা পরে স্থিতিপন্থীদের ভাবনা-চিন্তায়। মমতার রাজনীতিতে স্ব-বিরোধিতা আছে, কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে থেকে তাকে জনবিরোধী নীতি গ্রহণ করতেই হতে পারে, তার রাজনৈতিক বিরোধিতা এখন থেকেই করা দরকার। কিন্তু তাকে সিআইএ-র এজেন্ট বলে প্রচার করে তাদের প( নেওয়া— যারা জনসংঘ বা কংগ্রেসের সংগে আঁতাতে অভ্যস্ত, যারা ( মতায় থেকে বহুজাতিক সংস্থার দাসত্ব করে— তা কী করে সম্ভব তা আমরা বুঝি না। মনে রাখতে হয় যে মানুষের সংগ্রামটা নিরন্তর, কিন্তু কারোর ( মতায় থাকাটা সাময়িক। যে-ই ( মতায় থাক না, তার অত্যাচারের বি(দ্ধে যে লড়াই করে তাকে অস্বীকার করা যায় না। বিকল্প না থাকায় এই অবস্থায় সাধারণ মানুষ মমতাকেই সুযোগ দিয়েছে। আন্দোলনের ময়দান কিন্তু তারা ছাড়ে নি। সাতাত্তরে এমনকি জনসংঘও 'বন্ধু' হতে পারে, তাহলে আজ মমতা 'ব্রাত্য' হবে কোন যুক্তি(তে?

রেলমন্ত্রী হয়ে মমতা নয়া-উদারপন্থা অনুসরণ করে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের প্রবর্তন করেছেন— এজন্য অবশ্য-ই তাঁর বিরোধিতা করতে হয়। তবে তিনি মার্কসবাদী নন, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বি(াস করেন না। স্থিতিবাদীরা যে তথাকথিত বামপন্থীদের সমর্থক, তারা যদি বি(ায়নের নক্সায় পশ্চিমবংগে পুঁজিবাদ নির্মাণ করার কাজটাকে বাধ্যবাধকতা বলে মনে করে, সংসদীয় গণতন্ত্রের হাত ধরে পর্নোকন্যা জন্মাবে— এই অনুমানের ভিত্তিতে 'পচা-গলা' সেই 'বামপন্থা'কে সমর্থন করার যুক্তি( আদৌ কি আর থাকে? যেন এখানে 'বাম' আমলে সংসদীয় গণতন্ত্রের থেকে উন্নততর এমন কোনো ব্যবস্থা বিরাজ করেছে, যা সিআই-এর অনুপ্রবেশে বাধা দিয়ে পর্নোকন্যা জন্মানো প্রতিরোধ করেছে। আর এর জন্যই মমতার আসা আটকানোটা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে, পরিবর্তনে উৎসাহী সমস্ত বিদ্বজ্জনরা ধান্দাবাজ হয়ে যান! পরিবর্তনে কেউ অনিচ্ছুক হতেই পারেন, সংসদীয় গণতন্ত্র তাঁকে দ্বিমত পোষণের এই অধিকার দিয়েছে। কিন্তু মতে না মিললেই কাউকে সিআইএ-র দালাল, কাউকে পর্নোকন্যার জন্ম দেওয়ার জন্য দায়ী, বা যারা ভিন্নমত পোষণ করবে তাদেরই ধান্দাবাজ ইঙ্গিত দেওয়াটা কি ঠিক? কোনও নকশালপন্থী বুদ্ধ-বিমানের হাত ধরলেই সে বিপ-বী, আর মমতার হাত ধরলেই সে প্রতি(য়াশীল!

আমরা মধ্যবিত্তরা সবাই দোলাচলে ভুগি। চিন্তার জগতে অস্পষ্টতা ও অসম্পূর্ণতা থেকেই কেউ দোলাচলে ভোগে। দোলাচলে ভুগলেই কেউ ধান্দাবাজ হয়ে যায় না। 'দোলাচল' আর 'দ্বিচারিতা'—এই কথা দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। আমরা বর্তমানে যে জীবনযাপন করছি তাতে কম-বেশি সবাই ধান্দায় আত্র(ান্ত, সেই অর্থে দ্বিচারী। নকশালপন্থী কেউ অতীতে ভুল করেছি বলে আলিমুদ্দিনের দ্বারস্থ হলে সেটা যদি 'শুদ্ধিকরণ' হয়, তবে মমতার হাত ধরলেই সেটা ধান্দাবাজি হয়ে যায় না। দুটো (েত্রেই যে ধান্ধাবাজি হতে পারে সেটা বলতে দ্বিধা কোথায়? আবার এটা দোলাচল-ও হতে পারে। সুতরাং রাজনৈতিক বিরোধিতার নাম করে যাকে খুশি যা খুশি বলে দেওয়ার অধিকার কারোর নেই।

**রণেশ রায়**

## লেখকের কথা

ব্যক্তি(গত রাগ-অনুরাগের কথা নিয়ে টানাটানি করার দরকার দেখছি না। কখনও কখনও রূঢ় কিছু কথা বলতে হয় আত্মর(ার স্বার্থে। বলার পর নিজেরই খারাপ লাগে। এগুলো হয়তো 'স্যান্ডো' করা, কিন্তু উপায় কী? আমি যেমন মনে করিনা যে 'প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির টানাপোড়েন' কথাটাকে একটা অভিনব বৌদ্ধিক মাত্রা জুড়ে অন্যদিকে টেনে নিয়ে বা ঠেলে দিয়ে 'কথায় কাটে কথার প্যাঁচ'-এর আশ্রয় নেওয়াটা ভালো। এটাও মনে করিনা যে পূর্বাপর সম্পর্কবিহীন কিছু বাক্য বা বাক্যাংশ ব্যবহার করে নিজের যুক্তি(র প( সমর্থন খোঁজা ভালো। এগুলো যে খারাপ, রূঢ় শোনালেও তা বলতে হয় আর বলার পর নিজেরই খারাপ লাগে। যাই হোক, ব্যক্তি(গতভাবে মালবিকা মিত্র সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। বরং বলবো, আমার উত্তর তাঁকে ব্যক্তি(গতভাবে আহত করে থাকলে আমি লজ্জিত। আমি ব্যক্তি(-আত্র(মণ পছন্দ করি না।

আমার মনে হয় পত্র লেখকের জবাবের মধ্যে একটা জ(রি রাজনৈতিক বিষয় আছে, যা নিয়ে কিছু কথা লেখা যায়। লেখার আগে বলি, এই বিষয়টা নিয়ে আরও বেশি চর্চা হওয়া দরকার, যেটা নকশালপন্থীরা করতে চান না, মালবিকা মিত্রও তাঁর আলোচনায় যাতে গু(ত্ব দেননি।

এদেশের বামপন্থী আন্দোলনে যাঁরা 'পচাগলা', সেই সংসদীয় বামপন্থীদের সঙ্গে যাঁরা বামপন্থী কিন্তু 'পচাগলা' নন তাঁদের রাজনীতিগত অবস্থানের তফাত কোথায়? রাজনীতিগত অবস্থান বলতে আমি বুঝছি রণনীতি ও রণকৌশলগত অবস্থান। অধঃপতন-এর বিষয়টায় পরে আসছি। যাঁরা 'পচাগলা' নন, আলোচনার সুবিধার জন্য তাঁদের যদি নকশালপন্থী বলি, তাহলে বলতে হবে 'বিপ-বের পথ' সংত্র(ান্ত বক্ত(ব্যটি বাদ দিলে তাঁদের

একটা বড় অংশের সঙ্গে সংসদীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত( প্রধান যে রাজনৈতিক দল সেই সিপিএম-এর কোনো বুনিয়াদী পার্থক্য নেই। রণনীতির প্রধান যে জায়গাটা, যেটা চিহ্নি(ত হয় কর্মসূচি-প্রস্তাবিত বিপ্-বের চরিত্র দিয়ে, সে জায়গায় দুই শক্তি(র বক্ত(ব্য একই ধরনেই— দুটি শক্তি(ই মনে করে ভারতের বিপ্-বের চরিত্র হলো জনগণতান্ত্রিক (নয়াগণতান্ত্রিক)। বাকি থাকে 'পথ' সংক্র(ান্ত বক্ত(ব্য। এখানে মতপার্থক্যের বিষয়টি স্পষ্ট এবং সংশোধনবাদের বি(দ্ধে লড়াই-এর অ( রেখাটি এখান থেকেই নির্ধারিত হয়েছিল সেই গত শতকের ষাটের দশকের শেষদিকে, যখন নকশালপন্থীরা সিপিএম ত্যাগ করে নূতন রাজনৈতিক দল গড়তে উদ্যোগী হন।

'বিপ্-বের পথ' সংক্র(ান্ত নকশালপন্থী বক্ত(টিকে রণনীতির অংশ হিসেবে এখনও যাঁরা ধরে রেখেছেন তাঁরা হলেন সিপিআইএমএল মাওবাদী। সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ সহ যাবতীয় আইনি লড়াই-এর সুযোগ নিয়ে গণভিত্তি বাড়ানোর কাজে যাঁরা যোগ দিয়েছেন, নকশালপন্থীদের সেই বাকি অংশের যাবতীয় দল-উপদলের চোখে 'বিপ্-বের পথ' এখন একটি রণকৌশলগত প্র(, যে কারণে তাঁরা এখন বলেন নির্বাচন বয়কট একটা রণকৌশলগত বিষয়। এইভাবে দেখলে বলতে হবে রণনীতিগত প্রে( সিপিএম-এর সঙ্গে এঁদের মতপার্থক্যের জায়গাটা অ-বুনিয়াদী। কথাটির রাজনৈতিক তাৎপর্য এই যে, 'বিপ্-বের পথ'-সংক্র(ান্ত নকশালপন্থী বক্ত(ব্যের উত্তরাধিকার এখন আছে মাওবাদীদের সাথে, বাকিরা সেটা ত্যাগ করেছেন। কেউ সেটা বলে করেছেন, কেউ সেটা না-বলে করেছেন। যে মাত্রায় এঁরা সংসদীয় সংগ্রামে অংশগ্রহণ করছেন, সে মাত্রায় এঁরা ফিরেছেন পুরনো ধারার আন্দোলনে। সে জন্য বলা যায়, ভারতে এখন বামপন্থা অনুশীলনের দুটি প্রধান ধারা আছে— একটি সংসদীয় সংগ্রামমুখী ধারা, বহু নেতিবাচক অভিজ্ঞতা সহ সিপিএম যার সিম্বল, অন্যটি সশস্ত্র সংগ্রামমুখী ধারা, সিপিআইএমএল-মাওবাদী যার প্রধান প্রতিনিধি।

যাঁরা বলবেন, না তা নয়— সশস্ত্র সংগ্রাম এবং সংসদীয় সংগ্রাম 'কম্বাইন' করার একটা ধারা আছে, তাঁদের বক্ত(ব্য নিয়ে তাত্ত্বিক সমস্যা বাড়ে। এই কম্বাইন করা বা দুটিকে মিলিয়ে চলার কাজটা কীভাবে হবে, অর্থাৎ এর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ রণকৌশল কী, এটা নিয়ে তাঁরা থাকেন চরম বিভ্রান্তির মধ্যে। চা( মজুমদারের 'সশস্ত্র সংগ্রাম'-এর লাইন থেকে বেরিয়ে আসার পর গত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে কার্যত যা হয়েছে তা হলো ধাপে ধাপে তাঁরা 'গণ আন্দোলন', 'পঞ্চায়েতে অংশগ্রহণ', 'বিধানসভা-লোকসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ'— এই পর্যন্ত এসেছেন এবং এর মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম 'কম্বাইন' করার কোনো ল( ণ দেখা যায় নি। বাকি আছে 'সরকারে অংশগ্রহণ', সেটা নিয়েও এখন আর অতটা উষ্মা নেই। 'ক্র(ান্তিকালীন পরিস্থিতিতে' সেটা ডিমিট্রিভ অনুমোদিত, মালবিকা মিত্রও 'ঝড়ের রাতে শুঁড়িখানায় আশ্রয় নেওয়া' অনুমোদন করেন। শুধু নিয়মমাফিক নির্বাচনে সরকার গড়ার সুযোগ এলে কী হবে (১৯৬৭ সালে সিপিএম যে পরিস্থিতির সামনে এসে পড়েছিল) সেটা আছে আলোচনার বাইরে। আলোচনায় এসে গেলে কী হবে, বলা মুশকিল। এঁদেরই একাংশ যখন 'পচাগলা' বামপন্থীদের চেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের আপস করে তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রীসভায় ঢুকে পড়েন তখন মনে হয় 'পথ' সংক্র(ান্ত বিতর্কটাকে এঁরা যদি আরও নির্মোহ দৃষ্টিতে করতে পারতে তাহলে হয়ত এই সব ট্রাজেডি (না প্রহসন?)-এর হাত থেকে বহু শহিদের রক্তে( রাঙা এই আন্দোলনটির সম্মান র( ার কাজটি অন্তত করতে পারতেন তাঁরা। এ জন্য কাউকে দোষ দেব না। আমার ধারণা, 'পথ' সংক্র(ান্ত পুরনো ধারণাটা ত্যাগ করার পর থেকে এঁরা আছেন বিভ্রান্তির মধ্যে যা থেকে মুক্তি( পেতে হলে আন্তর্জাতিক মহাবিতর্ক-উদ্ভূত বিষয়গুলি থেকে শু( করে নকশালপন্থী আন্দোলনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক অভিজ্ঞতাগুলো নিয়ে আরও খোলামেলা আলোচনায় আসতে হবে এঁদেরকে, সংশোধনবাদের অবসেসন কাটিয়ে তুলতে হবে এবং 'বিলোপবাদ'-এর আশঙ্কা থেকে মুক্তি( পেতে হবে। এটা না করলে বিভ্রান্তি কাটবে না। বিভ্রান্তি না কাটলে নিজেদেরকে মতাদর্শগতভাবে একজোট রাখা আরও কঠিন হবে। গত চল্লিশ বছরে এরা যে ক্র(মাগত নিজেদেরকে বিভাজিত করে গেছেন তার কারণ এটা। নিজেরাই যেখানে বিভাজিত এবং বিভ্রান্ত, সেই অবস্থায় শ্রমজীবী মানুষরা এঁদের ভরসা করে সংগঠন গড়বেন— এটা হবার নয়। গত চল্লিশ বছরে এঁরা যে ক্র(মশ জনবিচ্ছিন্ন হয়েছেন, তার কারণও এটা।

এই অবস্থায় দেশের সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী— যাঁদের ওপর নয়াউদারবাদী অর্থনীতির আক্র(মণ ক্র(মশ তীব্র হচ্ছে, তাঁরা কী করবেন? এঁরা মাওবাদীদের সঙ্গে যেতে পারেন সরাসরি সংগ্রাম গড়তে, অথবা এঁরা থেকে যেতে পারেন 'পচাগলা' বামপন্থীদের সাথেই— থেকে যেতে পারেন এটা জেনেই যে এই বামপন্থীরা তাঁদের যে কাbWত ভবিষ্যৎ সেটা গড়বেন না। দুঃখজনক হলেও এটা সত্যি যে তৃতীয় কোনো বিকল্প এঁদের জন্য খোলা নেই। গণআন্দোলন-পন্থী নকশালপন্থীরা এখনও এঁদের আস্থা অর্জন করার জায়গায় এসে পড়েন নি। মাওবাদীদের নিয়ে সমস্যা হলো, তাঁদের এমন কোনো গণলাইন নেই যার সাহায্যে শ্রমজীবীদের আশু সংগ্রামের চাহিদা পূরণ করা যায়। যে ব্যাঙ্ককর্মী চাইছেন নয়াউদারবাদ নির্ধারিত ব্যাঙ্ক-সংস্কারের বি(দ্ধে প্রতিবাদ করতে, তার জন্য প্রয়োজনীয় আধার এঁদের নেই। এরা জঙ্গলমহলে গিয়ে হাতে অস্ত্র ধরে নয়াউদারবাদকে পরাজিত করে অন্য ধরনের ব্যাঙ্কব্যবস্থা কায়েম করার কথা শুনবেন না। তাহলে এঁরা যাবেন কোথায়? মাওবাদীদের সম্পর্কে আরও বলা যায়, এমনকি জঙ্গলমহলে তাঁদের গড়া আন্দোলনের সুফল যখন

তৃণমূল তার ভোটের বাক্সে ভরতে চাইল, সেটা রোখার সাধ্যও মাওবাদীদের ছিল না। না থাকার কারণ এই নয় যে এটা ছিল তাদের হিসাবের বাইরে। না থাকার কারণ— ভোট বয়কটকে রণনীতির অংশ করে তুলে এঁরা নিজেরাই নিজেদের গোলমালে ফেলে দিয়েছিলেন। আমার ধারণা, শেষ পর্যন্ত এই অঞ্চলে 'মূলস্রোত'-এর রাজনীতিতে ফেরার প্রবণতা বাড়বে এবং তার মধ্য দিয়ে 'পথ' সংত্র(াস্ত বিতর্কটির সমাধান হবে এক অত্যন্ত অনভিপ্রেত পথে। যাই হোক, মোদ্দা কথাটা এই যে এদেশের সুবিপুল শ্রমজীবীদের আশু সংগ্রামের আকাbW। ধারণ করার মতো কোনো আধার দেওয়া মাওবাদীদের প( সম্ভব নয়। যোগ করা যায় যে যতদিন না তাঁরা 'পথ' সংত্র(াস্ত আলোচনাটিকে রণনীতির জায়গা থেকে রণকৌশলের জায়গায় নামিয়ে আনছেন, ততদিন এই আধার গড়ার কাজটা তাঁরা করে উঠতেও পারবেন না।

বিভ্রান্ত নকশালপন্থী নয়, পচাগলা বামপন্থীও নয়— শ্রমজীবী মানুষরা তাহলে তাঁদের আশু সংগ্রাম গড়ার আধার কোথায় পাবেন? একটা উত্তর এরকম হতে পারে যে, এই আন্দোলনগুলির আধার জোটাবেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো। যাঁরা আশু সংগ্রামের সঙ্গে ( মতা দখলের ল( ্যটিকে জুড়তে চান (মার্কসবাদীরা সেটাই চান, 'আন্দোলনের জন্যই আন্দোলন'-এর তত্ত্বে তাঁরা আস্থা রাখেন না), তাঁদের কাছে এর চেয়ে ট্র্যাজেডি আর কিছু হতে পারে না। স্বেচ্ছাসেবী বা এনজিও আন্দোলন থেকে একটা সুস্থসবল বামপন্থী (পড়ুন মার্কসবাদী) আন্দোলন গড়ে উঠবে, কোনো যুক্তি(তেই এটা দাঁড় করানো যায় না। এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত যায় শাসকশ্রেণীর খপ্পরে, কিংবা সেটা শেষ হয় ব্যর্থতায়। যে মতাদর্শ আন্দোলনের সঙ্গে ( মতাকে কিংবা রাজনৈতিক ( মতাকে যুক্ত( করতে চায়, কোনো এনজিও আন্দোলন সে মতাদর্শের ওপর দাঁড়ায় না। কেননা সে ধরনের মতাদর্শ এনজিও করতে উদ্বুদ্ধ করে না, উদ্বুদ্ধ করে রাজনৈতিক দল গড়তে। সুতরাং শ্রমজীবী মানুষরা যদি দলে দলে এনজিও-তে নাম লেখান, সেটা হবে দুর্ভাগ্যজনক। বাস্তবে সেটা হয়ও না, কারণ শ্রমজীবীরা তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই গণআন্দোলনের সঙ্গে ( মতার রাজনীতিকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেন। এবং সেজন্যই এঁরা এনজিও করেন না।

নকশালপন্থীরা যতদিন 'পথ' সংত্র(াস্ত বিতর্ক সাঙ্গ করতে না পারবেন, বামপন্থী মতাদর্শ আশ্রিত শ্রমজীবীরা ততদিন এই 'পচাগলা' বামপন্থীদের সঙ্গেই থেকে যাবেন, কারণ তাঁদের অন্য কোথাও যাবার জায়গা নেই। এঁদের (োভ থাকে নেতৃত্বের উপর, বড় বড় পার্টি অফিস গড়ে জাঁকিয়ে বসা বাম নেতাদের এঁরা মনে মনে অপছন্দ করেন, ( মতার ভাষা এঁদের পছন্দ নয়। কিন্তু প্র্যাকটিকাল প্র( যেটা এঁদের থাকে, সেটা হলো— কোথায় যাব আমরা? মমতা বন্দোপাধ্যায়ের পরিবর্তন-এর আন্দোলন এঁদের কাছে একটা প্রাকটিক্যাল উত্তর এনেছে— তৃণমূলের সঙ্গে এসো। যে পরিমাণে শ্রমজীবী মানুষ এই বক্ত(ব্যের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে একমত হবেন, বামপন্থী আন্দোলনও ( তিগ্রস্ত হবে সেই পরিমাণেই। এই মানুষরা আস্থা হারাবেন বামপন্থাতেই এবং তার ফলে নকশালপন্থীরা যখন পথ সংত্র(াস্ত বিতর্ক সাঙ্গ করে শ্রমজীবীদের একটা স্পষ্ট এবং বিকল্প বামপন্থী ধারায় সংগঠিত করতে আসবেন, তখন তাঁরা কঠিনতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন। সচেতন কোনো বামপন্থীরই উচিত নয় এই কঠিনতর পরিস্থিতি তৈরি করার প্রয়াসের অংশীদার হওয়া। পরিস্থিতি অনিবার্যভাবে সেদিকে গেলেও বলতে হবে 'এ পরিবর্তন আমরা চাইনি'। তাতে 'পচাগলা' বামপন্থার যতটা সুবিধা করে দেওয়া হবে তার চেয়ে বেশি সাহায্য করা হবে স্বধর্মে স্থির থাকার বুনিয়াদী মতাদর্শগত দায়িত্ব পালন করার দায়বদ্ধতা র(ায়। বহু বামপন্থীই পরিস্থিতিকে এভাবে বুঝেছেন। সে কারণেই 'পরিবর্তন' এখন একটা বাস্তব ঘটনা— এটা যেমন সত্যি, এটাও সমান বাস্তব যে বহু বামপন্থী স্বধর্মে স্থির থাকার অঙ্গীকার পুন(চ্চারণ করছে এবং দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা সত্যি যে অনেকে এটা করছেন 'পচাগলা' বামপন্থীদের ফাঁকা হয়ে যাওয়া অফিসে বসেই। এ কাজটাই তাঁরা করতে পারতেন গণআন্দোলনমুখী নকশালপন্থীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে। দুর্ভাগ্য এটাও যে এখন আবার এই নকশালপন্থীরা রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং 'শ্রাদ্ধশতবর্ষের' অপূর্ব সমাহারে গড়া তৃণমূল রাজনীতির মধ্যে প্রগতিশীলতার উপাদান আহরণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে আমার মনে হয়, 'পথ' সংত্র(াস্ত বক্ত(ব্যটিকে যাঁরা রণকৌশলের বিষয় মনে করেন, তাঁদের উচিত হবে সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্র( সিপিএম-এর কাছ থেকে কী ইতিবাচক ও নেতিবাচক শি(া পাওয়া গেল, সেটার নির্মোহ বি(-ষণের কাজটাকে গু(ত্ব দিয়ে চর্চায় আনা। এ ধরনের কথা বললে হবে না যে 'আমরা ভোটে যাব কিন্তু ( মতায় যাব না'। সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ যদি রণকৌশলের বিষয় হয়, তাহলে মনে রাখতে হবে, এ রকম ফতোয়া দেওয়া যায় না। এটাও বলা যায় না যে ত্র(াস্তিকালীন পরিস্থিতি ছাড়া এ ( মতায় যাওয়া উচিত নয়। মাপকাঠিটি হওয়া উচিত গণ আন্দোলন বিকাশের (েত্রে, বাম হেজেমনি বিকাশের (েত্রে কতটা সহায়ক হয়, সেইটা। সিপিএম এ বিষয়টিকে প্রয়োগে এনেছেন, নকশালপন্থীরাও সীমিত (েত্রে (পঞ্চায়েত স্তরে) এ নিয়ে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। এ থেকে বহু ইতিবাচক শি(া পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে অধঃপতনের বহু ঘটনাও। উচিত হবে এগুলির সারসংকলন করে একটি কার্যকর গণলাইন গড়ে তোলা, নকশালপন্থীরা আজও যে কাজটা করে উঠতে পারেন নি। সংসদীয় রাজনীতি ও সংসদীয় ( মতা সংত্র(াস্ত দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট ও জনমুখী না হলে সাধারণ শ্রমজীবীর আস্থা এঁরা অর্জন করতে পারবেন না। মানুষ এঁদের বিচ( ণতার ওপর নির্ভর করতে পারবেন না। মনে

রাখতে হবে, যে বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ নয়া উদারবাদের আত্র(মণের সামনে দাঁড়িয়ে লাল ঝান্ডার আশ্রয় খোঁজেন, প্রতারিত হলেও তাঁরা এই 'পচাগলা' বামপন্থার সঙ্গেই থেকে যাবেন, যদি নকশালপন্থীরা তাঁদের আন্দোলন ধারণ করার মতো রাজনৈতিক বিচ( ণতা অর্জন না করেন। তেত্রিশ বছর আগে যা হয়েছে, এখনও সেটাই হবে— এঁরা অপ্রাসঙ্গিকই থেকে যাবেন। কেন এটা ঘটবে, সেটা উপলব্ধি করা কঠিন নয়। ব্যক্তি( হিসেবে আমি, (ুদ্র রাজনৈতিক দলের নেতা হিসেবে আমি, ছোট পত্রিকার সম্পাদক গিসেবে আমি স্বচ্ছন্দে এই 'পচাগলা' বামপন্থীদের সঙ্গত্যাগ করে সিপিএম-এর কুকীর্তির ফিরিস্তি গেয়ে বেড়াতে পারি, আমার (ুদ্র বৃত্তে তাতে আমি সম্মানের আসনেই প্রতিষ্ঠিত থাকব। সাধারণ মানুষ এটা পারেন না, কারণ সংঘবদ্ধ না থাকলে যে আরও বিপদ, বেঁচে থাকতে গিয়ে সেটা তাঁরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। যতদিন না গণ কার্যকলাপ বিকাশের জন্য বিকল্প কোনো লাইন আসে এঁরা থাকবেন এই 'পচা-গলা'দের সঙ্গেই, অথবা এঁরা তৃণমূলের ঝান্ডা ধরবেন।

এভাবে দেখলে বোঝা যায়, আজকে সিপিএম-এর যে সমস্যা, সেটা আসলে বাম আন্দোলনেরই সমস্যা। নকশালপন্থীরা যদি সংসদীয় রাজনীতির মধ্যে থেকে গণ-কার্যকলাপ বিকশিত করতে চান, তাঁদের জন্য অপে( া করে আছে সিপিএম যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে তার সবটাই। এ সমস্যা কীভাবে মোকাবেলা করতে হবে, সেটা নিয়ে এখন বামপন্থীদের মধ্যে যে গভীর আত্ম-অনুসন্ধান চলছে, তাঁদেরও উচিত হবে সেগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচারবিবেচনা করা। 'ওরা সংশোধনবাদী, আমরা বিপ-বী( ওদের এটাই হবার কথা, আমাদের এটা হবে না'— এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। 'পথ' সংত্র(ান্ত বিতর্কের শেষে যদি দেখা যায় এঁরা এবং ওঁরা— দুপ( ই এক রাজনীতি করছেন, এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হবে? যদি বলেন, পথটায় সংসদীয় রাজনীতি আছে কিন্তু ( মতায় যাবার প্র(্ন নেই, আমার অনুমান সে পথ এতদিনের মতো করেই গণসমর্থন অর্জনে ব্যর্থ হবে। 'পচাগলা' বামপন্থাকে নিয়েই বাঁচতে হবে বামপন্থী শ্রমজীবী মানুষদের।

**সংযোজন রণেশ রায়ের প্রবন্ধ**

ওয়ালেশার আন্দোলন সিআইএ-র টাকাখাওয়াদের আন্দোলন এটা না শুনে শুধু তার কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম একদা। এ থেকে শি( াটা এই নয় যে সব প্রতিত্রি(য়াশীলের আন্দোলনই সিআইএ-র টাকাখাওয়াদের আন্দোলন। এ থেকে শি( াটা এটাই যে শুধু কথা শুনে মুগ্ধ হওয়াটা ঠিক নয়, ভাষা সব সময় মনের ভাব প্রকাশ করে না, ভাষা অনেক সময় মনের ভাব গোপনও করে। এটা থেকেই লিখেছিলাম, যাঁরা 'পরিবর্তন' নিয়ে লাফাচ্ছেন তাঁদের অনেকেরই মতলব ভালো নয়। এঁরা বামপন্থী আন্দোলনের বিকাশ চান না, এঁরা এ রাজ্য থেকে বাম মতাদর্শই তাড়াতে চান। এঁরা সিআইএ-র টাকায় চত্র(ান্ত করছেন, একথা আমি লিখি নি। বস্তুত, ও রকম কিছু আমি ভাবিও না। এঁদের অনেকেই আছেন যাঁরা মতাদর্শগভাবেই বামপন্থার বিরোধী। এঁরা মনে করেন নয়াউদারবাদই ঠিক( এ নিয়ে তাঁরা টেকনিক্যাল প্রবন্ধও লেখেন জার্নালে। রণেশ রায় যে রাজনীতির সমর্থক, এঁরা সেটারও ঘোরতর বিরোধী। আনন্দবাজারের নেতৃত্বে সংগঠিত এই বুদ্ধিজীবীদের একাংশ এক সময় ছিলেন 'ব্রান্ড বুদ্ধ'র উগ্র সমর্থক। অটোমোবাইলভিত্তিক 'বিগ পুশ' (যা সিঙ্গুর মডেল)-এর বি(দ্ধে (ুদ্র ও মাঝারি শিল্পভিত্তিক উন্নয়নের কথা বলে এঁদের অনেকের বিরাগভাজন হয়েছেন এই লেখক স্বয়ং। আমার ধারণা, কালত্র(মে এঁরা বুঝেছেন, সিপিএম এঁদের অ্যাজেন্ডা কার্যকর করার (ে ত্রে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়, কারণ 'ব্রান্ড বুদ্ধ' নিয়ে বি( াভ রয়েছে বামফ্রন্টের মধ্যেই। আনন্দবাজার এবং তার সঙ্গে এঁরাও সঙ্গে সঙ্গে ভোল বদলালেন এবং 'মা-মাটি-মানুষ'-এর প( ধরলেন। এদের কথা তখন অন্য রকম হয়ে গেল। অনেক র‍্যাডিকাল কথাও এঁরা বললেন। কিন্তু সে সব কথা এঁদের মনের কথা নয়। এর সঙ্গে সিআইএ-র সম্পর্ক আছে, আমি অন্তত সেটা মনে করি না এবং সে জন্যই এ সংত্র(ান্ত যা কিছু রণেশ রায় লিখেছেন, আমার রচনার প্রে( িতে তা অপ্রাসঙ্গিক। মমতা বন্দোপাধ্যায়ের রাজনীতি নিয়ে দেখার কিছু নেই। বহু কিছুর সমাহারে গড়া এ রাজনীতির ভিত্তি হলো 'পপুলিজম', নয়াউদারবাদের যুগে যা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ইতিমধ্যেই জঙ্গলমহলের রাজনীতি নিয়ে তিনি কথা বলছেন রাষ্ট্রের ভাষায়। মাওবাদী 'সমস্যা'র সমাধান তিনি খুঁজবেন একদিকে সালভা জুডুম ও যৌথবাহিনী লেলিয়ে, অন্যদিকে 'উন্নয়ন' ঘটিয়ে। যে বিকল্প উন্নয়ন পন্থা রণেশ রায়ের চিন্তায় আছে, মমতা বন্দোপাধ্যায়ের চটকদারি এবং চমক সৃষ্টি-মুখী উন্নয়নচিন্তায় তার কোনো স্থান নেই। সিঙ্গুরে তিনি টাটাকে তাড়িয়ে ছাড়বেন কেননা সেটা তাঁকে রাজনৈতিক মাইলেজ দেবে। কিন্তু সেটা কোনো বিকল্প উন্নয়ন পন্থার সূচনাবিন্দু হবে না।

সিপিএম রাজনীতি নিয়ে অনেক কথা তিনি বলেছেন। এ সবের আলোচনা আমার প্রবন্ধ-সং(-ষ্ট নয়। শুধু একটা কথা মনে রাখতে বলব। 'বিপ-বের পথ' সংত্র(ান্ত আলোচনায় নকশালপন্থীরা যতদিন বিভ্রান্তি ও অস্বচ্ছতার মধ্যে দিন কাটাবেন, বামপন্থী মানুষেরা ততদিন এই 'পচাগলা' বামপন্থীদের সঙ্গেই থাকবেন। দুঃখজনক হলেও এটা সত্যি।

'পরিবর্তন'-এর ধাক্কায় যাঁরা লালপতাকা ফেলে তৃণমূলের ঝান্ডা ধরছেন, তাঁদেরকে কেন্দ্র করেই বিকল্প বামপন্থা গড়ে উঠবে— এ ধারণা ভুল, কোনো ঝান্ডার সাথে সাথে ইডিওলজি বদলায়। এ বদল নিঃশব্দ বদল, কিন্তু এ পরিবর্তন সবচেয়ে বেশি বিড়ম্বনায় ফেলে র‍্যাডিক্যাল রাজনীতিকেই।

**পাঠকের কলমে**

# মানবাধিকার আন্দোলন আইনের চৌহদ্দিতে বাঁধা পড়ে না

*অনীক*-এর জুন সংখ্যায় শ্রী সঞ্জীব আচার্যের লেখাটা পড়লাম। নিঃশর্ত বন্দীমুক্তি( নিয়ে আপত্তির যে কারণগুলি কোনো কোনো মহলে সাম্প্রতিককালে চর্চিত হচ্ছে লেখক তার প্রতিটি ধরে ধরে শুধুমাত্র উত্তর দিয়েছেন তাই নয় আপত্তির যুক্তি(গুলিকে খণ্ডনেরও চেষ্টা করেছেন। রাজনৈতিক কারণে বন্দীদের শর্তহীন মুক্তি(র দাবির একজন সমর্থক হিসাবে আমি শ্রী আচার্যের লেখাটার প( কিছু সংযোজন করতে চাই।

যে সমস্ত মানুষজন রাজনৈতিক কারণে পশ্চিমবঙ্গে বন্দী আছেন রাজ্য সরকার তাঁদের সবার বি(দ্ধে রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন ভঙ্গের অভিযোগ এনেছে। আইনের বে-আইনি প্রয়োগ সরকার আকছার করে থাকে— এই সত্যটাকে যদি আলোচনার খাতিরে আপাতত বিবেচনার বাইরে রাখি তাহলে মানতে হবে রাষ্ট্রীয় আইনকে সম্মান জানাতে গেলে বন্দীমুক্তি(র দাবিটাই করা যায় না। অথচ যুগে যুগে রাষ্ট্রের কাছে বন্দীমুক্তি(র দাবি জানিয়ে আপামর জনগণ বারংবার সোচ্চার হয়েছেন। এর অর্থ হল এই, প্রচলিত আইনের কাছে গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ তাঁদের আবেগ বা আকাঙ(াকে কখনো বন্ধক দেননি। আইনের বাইরে গিয়ে সাধারণ মানুষের যে দাবি, সমাজ প্রগতিতে তা সব সময়ই এক গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এতে এটাই প্রমাণিত হয়, কেবলমাত্র আইন দিয়ে সমাজকে বেঁধে রাখা যায় না। তাই রাষ্ট্র না চাইলেও আইনের সীমানার বাইরে সব সময়েই থেকে যায় শক্তি(শালী এক সামাজিক কণ্ঠস্বর, মানবিক আকাঙ(া বা মানবাধিকারের দাবি।

বন্দী মুক্তি(র দাবিটাকে যদি আমরা এই আলোতে দেখি তবে মানবিকতার বা মানবাধিকারের প্র়গুলোকেই কেবল বিচার করা বাঞ্ছনীয়, আইন বা বে-আইন কিংবা অহিংসা বা হিংসার প্র় নয় কারণ এই প্র়গুলি রাষ্ট্রই মূলত সামনে নিয়ে আসে। মানবাধিকার আন্দোলন রাষ্ট্রের তোলা প্র়কে অস্বীকার করেই এগিয়ে চলে। আর যদি একান্তই আন্দোলনকারীর সহিংস (রাষ্ট্রের মতে) পথের কারণে তাকে বন্দী রাখার যুক্তি(কে মেনে নিতে হয় তবে সরকারের হয়ে যারা সহিংস আচরণ করে তাদের মুক্ত( থাকাটা আমরা মেনে নেব কোন যুক্তি(তে? সরকারের তরফের এইসব অপরাধীদের বিচারের দাবিটা মানবাধিকারের কর্মীরা করেন ঠিকই, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তারা দিব্যি মুক্ত( অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে থাকেন আর আমরা অবিচল হয়ে তাই দেখতে থাকি। প(ান্তরে, সহিংস রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্ত( দেখতে আমরা রাজী নই। নিজে সহিংস হয়ে সরকার হিংসার যুক্তি(তে রাজনৈতিক কর্মীকে কারাগারে আটক রাখবেন, এটা মেনে নিলে মানবাধিকারের দৃষ্টি থেকে তা শুধু অন্যায়ই নয়, দ্বিচারিতাও বটে।

এমন কথাও উঠছে, রাজনৈতিক কর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তি(র দাবী মেনে নিলে তপন, সুকুর বা রথীন দণ্ডপাটের ছাড়া পেয়ে যাওয়াটাকেও ঠেকানো হবে কোন্ যুক্তি(তে। এমন ভাবনার মধ্যে হয়ত বা রয়েছে মানবাধিকার আন্দোলনকে ভুল বোঝার প্রবণতা। মানবাধিকার আন্দোলন চলে অনেকগুলি খাত বেয়ে। সে যেমন নিজের প্রতি ঘটে যাওয়া অন্যায়ের অবসান চায় তেমনি চায়, যে অন্যায় করেছে তার বিচারটাও। তাই মানবাধিকারের যুক্তি( একদিকে যেমন চাইবে রাজনৈতিক কর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তি( অন্যদিকে সে রাখবে তপন, সুকুর বা দণ্ডপাটের শাস্তি বা বিচারের দাবিটাও। এই দুটো দাবি পাশাপাশি চলতে থাকলে মানুষের প্রতি যারা অপরাধ করেছে তাদের মুক্তি(র সম্ভাবনাটা আসে না। প্র় উঠতে পারে, একই যুক্তি(তে তো তাহলে সহিংস একজন রাজনৈতিক কর্মীর মুক্তি(র সম্ভাবনাটা আসে না। প্র় উঠতে পারে, একই যুক্তি(তে তো তাহলে সহিংস একজন রাজনৈতিক কর্মীর মুক্তি(ও আটকে যেতে পারে সেই কর্মীর দ্বারা (তিগ্রস্থ হয়েছে এমন কারোর দাবির ভিত্তিতে। হ্যাঁ, এমনটা সাম্প্রতিক আমলে ঘটেছে তামিলনাড়ুতে। কিন্তু সেটা ঘটেছে সাধারণ মানুষের দাবির ভিত্তিতে নয়, আইনের পথে। আমরা প্রথমেই বলেছি, মানবাধিকার আন্দোলন আইনের চৌহদ্দিতে বাঁধা পড়ে না। আইনের সীমানা ছাড়িয়েই তাকে দাবিগুলি রাখতে হয়। এবং এহেন বে-আইনি দাবি সরকারের সামনে রাখা সম্ভব কেবলমাত্র ব্যাপক মানুষের সমর্থনের মধ্য দিয়ে। এই দাবিটা বেশ জোরালো ছিল বলেই আগাপাশতলা রাষ্ট্রবাদী দল হয়েও ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ও জনতা দল এবং পুনরায় ২০১১ সালে তৃণমূল তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে বন্দী মুক্তি(র প্রতিশ্রুতি রাখতে বাধ্য হয়েছিল। একইরকম জোরালো দাবি কী দণ্ডপাটেদের মুক্তি(র জন্য ওঠা সম্ভব? না তাদের বিচারের দাবিটাই থাকবে অনেক বেশি শক্তি(শালী? যাই ঘটুক না কেন, মানবাধিকারের প( জনমতটাই শেষ কথা বলবে। আর জনমতটার প্রতি যদি আস্থা থাকে তাহলে মিথ্যা আশংকার ভিত্তিতে রাজনৈতিক বন্দীদের আটক রাখার যুক্তি(কে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। হ্যাঁ, দণ্ডপাটেদের মুক্তি( পাবার ীণ সম্ভাবনাকে মাথায় রেখেও।

**প্রেমাংশু দাশগুপ্ত**

আগস্ট ২০১১ v ১৫ টাকা

দলতন্ত্র থেকে জনশক্তি( কোন্ পথে?

পরমাণু বিদ্যুৎ বর্জন q অধিকারের রাজনীতি

তদন্ত কমিশন— কিছু প্রাসঙ্গিক প্র(্ন

খুচরো ব্যবসায় বিদেশি লগ্নি

লিবিয়া নিয়ে মিথ্যাচার q মিশরে পিছু হটা

বিতর্ক q পুস্তক আলোচনা q পাঠকের কলমে

ই - মেল arunodaya1945@yahoo.co.in

[illegible] : [illegible] / [illegible] / [illegible]105 / 2007[illegible]09 [illegible] : 12026/65

[illegible] 48 [illegible] : 2 [illegible] 2011 [illegible]

# অনীক

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১১ বিশেষ সংখ্যা

---

*এবারের বিশেষ সংখ্যা*

## [illegible]

ও

## [illegible]

### [illegible]

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
অরিন্দম সেন
রতন খাসনবিশ
দীপংকর চক্রবর্তী

গৌতম নভলখা
ভরভরা রাও
সুকান্ত রায়

বার্নার্ড ডিমেলো
কে রামচন্দ্রন
সমরেশ মিত্র
গণপতি (সাক্ষাৎকার)

তৎসহ

**কবিতা** (শঙ্খ ঘোষ, সব্যসাচী দেব, বিশ্বজিৎ সেন, অশোক চট্টোপাধ্যায়)

**গল্প** (অমর মিত্র, সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ সেন, দীপংকর দাস, মীনাক্ষী সেন)

*এবং* **ঘটনাপ্রবাহ**

**ক্রোড়পত্র** বাংলা নাটকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রভাব অমল রায়

**প্রকাশিত হবে সেপ্টেম্বর-এর শেষ সপ্তাহে**

---

**জরুরি বিজ্ঞপ্তি**

অনীক যোগাযোগের ঠিকানা

*অনীক* । **প্রযত্নে পিপলস্ বুক সোসাইটি । ১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট।**
**কলকাতা - ৭০০ ০০৯ (*ফোন ০৩৩-২২১৯-৯২৫৬*)**

দীপংকর চক্রবর্তী (স্বত্বাধিকারী) কর্তৃক প্রযত্নে/পিপলস বুক সোসাইটি, ১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ, গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তী